পরম পিপাসা

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৬৭

৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি, এম, লাইব্রেরির পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

ছবি এঁকেছেন—শ্রীঅজিত গুপ্ত।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

সুসাহিত্যিকেষু—

পরম পিপাসা

॥ এক ॥

কোথাও কোনো সম্ভাবনা ছিলনা। তবু হয়ে গেল দুর্ঘটনা। এতটুকু পূর্বাভাস পায়নি কেউ। তাই বুঝি এমন মর্মান্তিক হলো।

মোমিনপুরের তিনমাথার মোড়টায় প্রত্যেকদিনের মতো আজ-ও সন্ধ্যা সাতটায় ভীড় হয়েছে। বঁড়শে, বেহালা আর ডায়মণ্ডহারবার রোডের বাসগুলো জমেছে স্ট্যাণ্ডে। টিন মোড়াই পাবলিক বাসের গায়ে চাপড় মেরে শব্দ তুলে কণ্ডাক্টর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছে যাত্রীদের—বেহালা, বঁড়শে, ঠাকুরপুকুর।

আজকের আকাশ গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘে আলো আঁধারি। বিষ্টি পড়ছে ঝিরি ঝিরি কণায়। সে বিষ্টি ইলসে গুঁড়ির মতো শ্রান্ত পথচারীর মুখে ঠাণ্ডা একটা আমেজ বুলিয়ে দিচ্ছে। অনেকটা কুয়াসার মতো। মানুষগুলোকে তেমন স্পষ্ট দেখা যায়না। রাস্তারধারের বাতির আলোয় পিচের রাস্তা চকচক করে।

এরই মধ্যে হলো দুর্ঘটনা। অসীমের সত্যিই কোন দোষ ছিলোনা। আলো আঁধারি-তে গাড়ীখানা তার বাঁদিকে মোড় ঘুরতে যাবে, এমন সময় তার সামনে এসে পড়েন ভদ্রলোক। রাস্তার ওপারে ডাবের দোকানে দাঁড়িয়ে ডাব খাচ্ছিলেন। আধাবুড়ো ছোটখাটো গরীব চেহারার মানুষটি। বারবার একে তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন—হ্যাঁ মশাই, বারোর-সি বাস কি বঁড়শেতে যাবে? সে বাস কি ঐ পারে পাবো?

হঠাৎ কানে গেল কণ্ডাক্টরের চীৎকার—বেহালা, বঁড়শে, ঠাকুর পুকুর।

ভদ্রলোক অমনি কোনদিকে না চেয়েই ছুটে নামলেন রাস্তায়। এদিকে ওদিকে না চেয়ে এমন করে কেউ রাস্তা পেরোয়না অফিসভাঙা ভীড়ের মধ্যে। এই বাস-ই একমাত্র বাস নয়—একটু দাঁড়ালে আরো বাস তিনি পাবেন। কিন্তু সে সব কথা যদি পথচারী ভাববে—তবে দুর্ঘটনা হবে কেন? ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে যেমন মাঝ পথে এসেছেন, পড়লেন অসীমের গাড়ীর সামনে। অসীমের মনে হলো কি একটা নরম জিনিষের ওপর দিযে পেরিয়ে গেল গাড়ী। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ আর জনতার কোলাহল তাকে বিভ্রান্ত করে ফেললো।

ব্রেক কষলো অসীম—গাড়ীটা থামলো পিচের রাস্তা ঘষটে একটা বিশ্রী শব্দকরে খানিকটা স্কিড্ করে গিয়ে। গাড়ী থামতে জনতা-ই টেনে নামালো তাকে। অসীমের ঘাড় ধরে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে প্রথমেই মন্তব্য করলো একজন।

—সিল্কের পাঞ্জাবী ধুতি পরে ফুর্তি করতে যাওয়া হচ্ছিলো বাবুর।

এভাবে কথা শুনে অভ্যস্ত নয় অসীম। এমন এক পরিস্থিতি-ও তার জীবনে কখনো আসেনি। আর কি হলো না হলো, তাই জানতে-ই তার মন তখন ব্যস্ত। দুর্ঘটনা হয়েছে, যার আঘাত লাগলো সে কোথায়? তাকে কেন দেখছেনা কেউ?

সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত এক যুবক। নিজেকে বাঁচাবার এতটুকু চেষ্টা করেনা। ভয় পেয়েছে কি না, তা-ও বোঝা যায়না। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকে এদিকে ওদিকে তাকাতে দেখা যায় শুধু।

কলকাতার রাস্তায় এমন কোনো অঘটন হলে, শাস্তি বিধানের ভার জনতা-ই নেয়। এবার অসীমের পিঠে, হাতে, গায়ে,

অজস্রধারে নেমে আসে জোড়া জোড়া হাতের কিল, চড়, ঘুষি। জামাটা গলার কাছে ধরে ছিঁড়ে নামায় কেউ ফালি ফালি করে। অসীম স্পষ্ট বোঝে, তার কপাল থেকে রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে নেমে আসছে। সে তবু হাতজোড় করতে চেষ্টা করে। বলে—শুনুন! আমাকে আপনারা মারুন কাটুন যা হয় করুন। কিন্তু ভদ্রলোককে নিয়ে চলুন হাঁসপাতালে!

—এঃ, বড় যে চিন্তা! বলি কিছু কি আর রেখেছেন তার?

—কেন, কি হয়েছে?

—বুক পাঁজরা রাস্তার সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে না?

—ছি ছি, এ কি করলাম।

জনতার এক অংশ পাশব একটা কৌতূহলের বশে গাড়ীর পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অসীমের ঘাড়ে একটা লাঠি বা ডাণ্ডা দিয়ে মারে কেউ। সে লাঠি মাথায় উঠতে পারে এই ধারণায় অসীম হাতটা মাথার ওপর তুলতে চায়। হঠাৎ 'পুলিশ! পুলিশ!' —চীৎকার শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভীড়। তীব্র বাঁশীতে সব কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে চলে আসে পুলিশের ভ্যান। পেছনে আসে এ্যাম্বুলেন্স।

জনতা সরে যেতে-ই অসীম বোঝে, তার শরীরটা আর তার বশে নেই। শরীরটা যেন ভেঙে চুরে পড়ে যাচ্ছে। অসীমের ঘাড়ের পেছনে আর বগলের নিচে হাত দিয়ে যখন তুলতে যান তাকে পুলিশঅফিসার, তখনই চোখে পড়ে অসীমের। চোখে পড়ে, দু'জনে সন্তর্পণে ধরাধরি করে তুলছে দেহটা এ্যাম্বুলেন্সে। যেন মানুষের দেহ নয়, অন্যকিছু। মাথা থেকে পা অবধি লালে লাল। একটা হাত শুধু অসহায় ভাবে লটপট করে ঝুলছে। সে হাতের মুঠোয় একটা ছোট্ট খাতা না কাগজ কি যেন ধরা।

হাতের সে অসহায় ভঙ্গী আর রক্তাক্ত সেই শরীরটা দেখে

এতক্ষণে যেন অসীম সত্যি সত্যি বোঝে—সে কি করেছে। তার গলাথেকে বেরিয়ে আসে একটা চাপা আর্তনাদ। অজ্ঞান হয়ে যায় অসীম।

অফিসারটি অভিজ্ঞ চোখে দেখেন আর নোট করেন খাতায়। বলেন—খুব সময়ে এসেছি। পেট্রলট্যাঙ্ক তো খুলে ফেলেছে। একমিনিট দেরী করলে জ্বালিয়ে দিতো গাড়ি। খুব বেঁচে গেছেন মশায়—। তা একটু দেখেশুনে চালান না কেন? কতদিন পেয়েছেন লাইসেন্স?

বিটের পুলিশ তার তৎপরতার নিদর্শন দিতে চেষ্টা করে। দুর্ঘটনা সে ঠেকাতে পারেনি। অসীমকেও বাঁচাতে পারেনি জনতার হাত থেকে। এখন সে এগিয়ে আসে। বলে—ভদ্রলোকের দোষ নেই। লোকটা এমন ভাবে এসে পড়লো

অসীমের কানে কোন কথা পৌঁছয়না। দু'খানা গাড়ী-ই চলে যায়। দুর্ঘটনার জায়গাটা ঘিরে তখনও মানুষ আর যানবাহনের ভীড়। এবার তারা চলতে সুরু করে। গাড়ীর টায়ারে আর বিষ্টির ঝিরঝির ধারায় মিলিয়ে যেতে থাকে রক্তের চিহ্ন।

রসারোডের পেছনে কালীঘাট আর ভবানীপুরের মোহানায় পুরনো গলিটার একুশ বাই তিন বাই এক-এর চূণ কালি খসা বাড়ীটায় তখন রোজকার মতো-ই রাত নামছে। গলিটা পুরনো, বাড়ীটাও পুরনো। এ বাড়ীতে যে সন্ধ্যা বা রাত নামে—তাতে কোন বৈচিত্র নেই।

বাড়ীতে বসে বসে তবু পলটুর মা অস্থির বোধ করলেন। কেন যে মনটা অমন অস্থির হলো, তা তিনি বলতে পারবেননা। পলটু-কে একবার পাঠালেন পাড়ার যোগেনবাবুর বাড়ী। বললেন—জিজ্ঞাসা করে আয় তো আজ কি অফিসে বেশী কাজ হচ্ছে?

যোগেনবাবু কিছু বলতে পারলেননা। হ্যাঁ, অফিস ভাঙলে পরে অডিটর প্রিয়বাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন বটে বিনয়বাবু। তারপরে তিনি কেন ফেরেননি বা অন্য কোথাও গিয়েছেন কি না, বলতে পারেননা যোগেনবাবু। তবে আজ তো তেমন কোন কাজের তাড়া নেই? ব্যস্ত হবার কি আছে? এখনই বোধ হয় আসবেন।

পলটুর দিদি সুজাতা বেরুচ্ছিলো টিউশনীতে। বললো—ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? ওখান থেকে রাঙাপিসীমার বাড়ী একবার যাবেন কথা ছিলো যে? সেখানেই গেছেন হয় তো?

—তা হবে।

ঘরে সেলাই নিয়ে বসলেন পলটুর মা। কিন্তু আবার যেন মনটা কেমন হয়ে গেল তাঁর। বিনয়বাবুর শরীরটা যে আজ খুবই খারাপ ছিলো। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে। অফিসে যেতে-ই চাননি তিনি। যাবার সময় বলে গেলেন—আজ তাড়াতাড়ি ফিরব। শরীরটা যেন সুবিধের লাগছে না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চেয়ে দেখেন পড়া ছেড়ে পলটু আশ্চর্য হয়ে তাঁর হাতের দিকে চেয়ে আছে। দেখে তিনিও লজ্জিত হলেন। ছুঁচটা শূন্যে ধরে আছেন তিনি। পলটুর শার্টটা পড়ে গিয়েছে চৌকিতে। নামিয়ে রাখলেন তিনি। বললেন—রাখালকে একবার ডাকবি পলটু? যা না! ও যদি ফোন করে খবর নেয়?

পল্টু বুঝতে পারেনা মা কেন এমন করে সব ভুলে ভুলে যাচ্ছেন আজ। বলে—

—মা, তোমাকে বললাম যে আমি?—ফোনে কি খবর পেয়ে রাখালদা হাঁসপাতালে গেছে?

—ওর বোনের কি ছেলে হলো? সেখানে গেছে?

—তা ত' জানিনা মা!

রাত আরো হয়। প্রায় দশটা বাজে। সুজাতা ফিরে আসে ছাত্রী পড়িয়ে। বলে—এখনো ফিরলেন না বাবা? কি হলো? কোথায় গেলেন?

নিজের মনের ব্যস্ততার-ই প্রতিধ্বনি মেয়ের গলায়, শুনে পলটুর মা আশ্চর্য হলেন। বললেন—কি করে বলি? তুই পলটুর মশারীটা টাঙিয়ে দে—নিজে খেয়ে নে।

সে কথা শুনলো না সুজাতা। মা-র সঙ্গে সঙ্গে সে-ও অপেক্ষা করতে লাগলো।

তবে বেশী অপেক্ষা করতে হলো না। বাইরের দরজা ফাঁক-ই ছিলো—অনেকগুলি মানুষের গলার শব্দ যেন শোনা গেল। অপরিচিত একটা গলা বললো, এই বাড়ী?

আর এমন আশ্চর্য, যে সঙ্গে সঙ্গে পলটুর মা-র মনে হলো এখনি কোন অশুভ বারতা বেজে উঠবে ঐ গলাটায়। আশঙ্কটা যেন দুলে দুলে ফুলে ফুলে, ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিতে থাকলো তাঁর মনে।

ততক্ষণে খুলে গিয়েছে দরজা। রাখালের সঙ্গে ঢুকলেন একজন পুলিশ অফিসার। পেছনে আরো লোক, অনেক লোক। এতলোক কেন?

রাখাল-ই এগিয়ে এলো। বললো

—সুজাতা একটিবার যেতে হবে তোমাকে আমার সঙ্গে। ইনি বলছেন...

কি যে হয়ে যায়—পলটুর মা চেয়ে-ই থাকতে পারেন শুধু। কানে তাঁর একটি কথা-ও পৌঁছয় না। কানটা এমন বধির হয়ে গেল কি করে? ঐ তো মুখ নড়ছে—কত কি বলে যাচ্ছেন অফিসারটি, সুজাতা-ও জবাব দিচ্ছে—পলটু এসে দাঁড়িয়েছে—সুজাতা ঐ জড়িয়ে ধরলো পলটুকে। কি বলাবলি করছে ওরা?

অফিসারটি পকেট থেকে টেনে বের করলেন কাগজের মোড়ক। কি যেন দেখালেন সুজাতাকে।

সহসা যেন বিপদের আর্তবাঁশী বাজিয়ে ইন্দ্রিয়গুলো বেঁচে ওঠে। গলার স্বর খুঁজে পান পলটুর মা। হাহাকার করে ওঠেন।

—ওরে এ যে তোর বাবার রুমাল, পানের ডিবে, টিফিন কৌটো। এত রক্ত কেন? এত রক্ত কোথা থেকে এলো?

সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেন পলটুর মা।

॥ দুই ॥

দুর্ঘটনা-ই বটে। অসীমের হাতে যে স্টিয়ারিংটা হঠাৎ বেইমানী করে বসলো, তা নয়। মনটা একটু অস্থিরও ছিলো অসীমের। সময়মতো গোপার বাড়ীতে পৌঁছবার তাড়া ছিলো একটা। কিন্তু সে জন্য এমন বিহ্বল হয়নি অসীম, যে এমনি একটা এ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে।

গোপার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আর পৌঁছনো হলোনা অসীমের। মোমিনপুরের মোড় ছাড়িয়ে বাঁ-হাতি ব্রিজটা রেখে ডানদিকে বাগান ঘেরা বাড়ীটায় অপেক্ষা করে করে তখন অতিথিরা অস্থির হয়ে উঠেছেন। গোপার মা সুনলিনী সকলকে আপ্যায়ন করছেন মিষ্টি কথায়।

—একটু বসতেই হবে যে! মস্ত একটা সুখবর রয়েছে। শুধু তো জন্মদিনের অনুষ্ঠান নয়! এখনি এসে পড়বে অসীম।

পাশের ঘরে গিয়ে স্বামীকে বললেন বিরক্তির সুরে—কি ব্যাপার বলতো? ফোন করেছিলে? নিয়েছিলে খবর? কি রকম দায়িত্ববোধ অসীমের বুঝিনা। এতক্ষণে এসে পড়া উচিত ছিল না?

প্রকাশবাবু বলেন—আমি ফোন করেছি। সুরেশবাবু বলেছেন যে সে রওনা হয়ে গিয়েছে। তুমি ব্যস্ত হয়োনা মিছামিছি। জানলে?

ব্যস্ত হতে চান না সুনলিনী। তবু কি মন থেকে যায় দুশ্চিন্তা? ঘুরে এসে এসে বসেন তাঁর বৌদির কাছে। বলেন—আসবার

পথে তো ঘুরে এসেছ ওখান থেকে। কেন দেরী হচ্ছে কিছু বলতে পার?

সুষমা আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি। এদিকে তিনি অসীমের ছোটমাসী, আর সুনলিনী তাঁর-ই ননদ। তিনি বলেন:

—না, তেমন ত কোন কারণ বুঝলাম না। আমাকে বসতে বললো। বললো—চল একসঙ্গেই যাব। আমি বসলামনা। তুমি ত' তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলে?

তখন দরজার দিকে চেয়ে গোপাও অস্থির হয়ে উঠেছে। কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা চলে? শুধু কি আশাভঙ্গ? মনে মনে অপমানিত লাগছে তার। এমনিতেই বড় অভিমানী গোপা। সহজেই চোখে জল আসে তার। আর এরকম আসতে দেরী অসীম আগে-ও করেছে। নানা সময়ে, নানাকারণে। তাতে মা মেয়ে দু'জনেই চটেছেন। সহজে-ই ধৈর্য হারান সুনলিনী।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশে সরকারী চাকরী করেছেন প্রকাশবাবু বিশপঁচিশ বছর। সেখানে প্রবাসী বাঙালীর জীবনযাত্রা চলে নিয়মবাঁধা ছন্দে। জীবনযাত্রার ব্যয় সেখানে কম। কাজ করবার মানুষ মেলে। সুনলিনী তাতেই অভ্যস্ত হয়েছেন। চাইবার আগেই পেয়েছেন সবকিছু। প্রকাশবাবু আরো আরো অনেক সুধী স্বামীর মতো মহাজ্ঞানী মহাজনের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করেছেন। সংসার চালাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন স্ত্রী-কে। ষোলো আনা নয়, আঠারো আনা-ই দিয়েছেন তাঁর হাতে।

কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছা সুনলিনীর সহজাত। সেইজন্যই, ধৈর্য্য তাঁর সহজে হারায়। গোপাকে-ও গড়েছেন নিজেরই ছাঁদে। বাইরে গোপাকে দেখলে বোঝা কঠিন, যে ঐ আদুরে প্রসাধনপ্রিয় মেয়েটির মধ্যেও একটা প্রভুত্বকামী আর অধিকার-প্রিয় মন আছে।

অধৈর্য হতে চান না সুনলিনী, তবু ক্ষণে ক্ষণে ধৈর্য হারান। গোপার রাঙাকাকীমা বিদায় নিতে আসেন। তাঁর-ও মেয়ে আছে। সে মেয়ে-ও বিবাহযোগ্য। অসীম তাঁদের চেনা-জানা ছেলে। তাঁরও কি ইচ্ছে ছিলোনা যে এই সুন্দর সুশ্রী ছেলেটির সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হোক? অবচেতন মন নয়, চেতনে-ই ছিল এই সাধের আশা। সুনলিনীর সৌভাগ্যে তাই, যদি-ও হিংসে করতে নেই, তবু যেন তাঁর একটু হিংসেই হয়েছিলো। তিনি কলকাতার-ই মেয়ে। বিয়ে হয়ে উত্তর কলকাতা থেকে পুবে গিয়েছেন। আদব কায়দা চলন বলনের জন্য সুনলিনীকে তিনি বেশ ভয় করে চলেন। তিনি যে জীবন দেখেছেন, ও যে জীবনের মধ্যে বাস করেন, তাতে সুনলিনী হচ্ছেন আধুনিকা।

তিনি থাকেন পৈতৃক বাড়ীতে বেলেঘাটায়। সে দোতলা বাড়ীতে প্রকাশবাবুদের তিনপুরুষের বাস। গেটের বাইরে মার্বেল-এর ফলকে প্রকাশবাবুর মৃত পিতামহের নামের কালো অক্ষরগুলো ধুয়ে গিয়েছে বিষ্টির জলে। সেই স্বনামধন্য পুলিশকোর্টের পেস্‌কার বাবুর অয়েলপেন্টিং বাইরের ঘরে ঢুকতে-ই সামনে চোখে পড়ে। আর চোখে পড়ে মজিলপুরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বংশতালিকা। এই বৃহৎ বংশের কে কোথায় কি সম্মান জনক সরকারী বেসরকারী পদে অধিষ্ঠিত, তা-ও নামের পাশে পাশে লেখা আছে। উকীল, ডাক্তার, সরকারী ইঞ্জিনীয়ার, ডেপুটি ও মুনসেফদের নাম এত পাওয়া যায় যে দেখে আর বুঝতে ভুল থাকে না, এটি একটি কৃতী বংশ। পূর্ব পুরুষের পেস্‌কারী বুদ্ধিতেই হয়তো সমৃদ্ধির গোড়াপত্তন হয়েছিলো, কিন্তু উত্তর-পুরুষ পুরুষকারে বিশ্বাসী। সেই সুনাম ও সমৃদ্ধির বিজয় বৈজয়ন্তী তাঁরা দিকে দিকে স্থাপনা করেছেন।

সে বাড়ীতে আজ-ও একসঙ্গে অনেকপাতা পড়ে। বংশের

প্রচলিত পূজাপার্ব্বনাদি সেখানেই সারা হয়। দেশঘর নেই—যাঁরা বিশ্বাস করতেন এইসব পূজাপার্ব্বন করে সত্যিই পুণ্যঅর্জন করা চলে, এবং সুন্দর সুন্দর মেয়েলি লোকাচার ও ব্রতকথা দিয়ে এই অনুষ্ঠানগুলিকে কল্যাণ-মণ্ডিত করতেন—সেইসব অন্তঃপুরিকাদের দিন চলে গিয়েছে। এখন ধর্ম বাঁচিয়ে রাখবার গুরুদায়িত্ব বর্তিয়েছে কর্মবীর কোন পুরোহিতের ওপর। স্বল্পসময়ে পূজা সেরে ধর্ম ও মোক্ষ উভয়কে তুষ্ট করে সামান্য প্রাপ্তিতে-ই খুশী হয়ে তিনি চলে যান।

তা ছাড়া সাংসারিক বহু গুরুকর্তব্য আছে। বিয়ে, সাধ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, লৌকিকতা কুটুম্বিতার নানা দায়িত্ব। গোপার রাঙা কাকীমা সেইসব ঝামেলা সামলান। রান্নাঘরে বসে ঠাকুরকে বারকোষ ভরে তরিতরকারী কুটে দেওয়া, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী তত্ত্বতাবাস করা—এ সবই তাঁর কাজ। তাঁদের বাড়ীতে আজ-ও কাঁঠালকাঠের বড়বড় পিঁড়ি পেতে কাঁসার থালায় ভাত খেতে বসেন সবাই। চালচলনে বন্দেজী ভাব এখন-ও আছে। কাঁচ বা এ্যালুমিনিয়মের বাসন এসে কাঁসাপেতলের ব্যবহার বন্ধ করে নি। ঘরে ঘরে যে আসবাব দেখা যায়, সেই সব খাট, পালঙ্ক, চেয়ার টেবিলে স্বাচ্ছন্দ্য না থাক বন্দেজীয়ানা আছে। সবই নিরেট এবং ভারী। গোপার রাঙাকাকীমা সগর্বে অতিথি কুটুমদের বলেন—

—এই আলমারী পঞ্চাশ বছর ব্যবহার হচ্ছে, এই খাটে আমাদের খুড়শ্বশুর শুতেন—এই কাঁসার গেলাস আমার শাশুড়ীর আমলের।

যাঁরা শোনেন তাঁরা মুগ্ধ হন।

আশ্চর্য্য কি, যে গোপার রাঙাকাকীমার কাছে সুনলিনীর সংসার একটা চরম আধুনিক বলে বোধ হয়। সুনলিনী বরাবর

বাইরে থেকেছেন—এখানে এলেন নিজের বাড়ী কিনে। তাঁর বাড়ীতে টেবিলে বসে খাওয়া হয়, সুনলিনী বাড়ীতে পায়ে চটি পরেন—বেরুবার সময়ে কুঁচিয়ে শাড়ি পরেন, কাঁধে ব্রোচ আঁটেন, চুড়িবালার সঙ্গে ঘড়ি-ও পরেন একটা। এততে-ও যদি আধুনিকা না হবেন সুনলিনী ত আর কোন আয়োজন লাগবে? ভেবে পান না গোপার রাঙ্গাকাকীমা।

তবে এতদিন বাদে তিনি-ও বলবার মতো একটা সুযোগ পেয়েছেন। বলেন,

—মেজদি, চললুম ভাই। তখন বললুম যে এই সব জন্মদিন, এনগেজমেন্ট, এ সব ক'রো না। বেশ দিন দেখে পাকাদেখার আয়োজন কর, তা শুনলে না ত। বিয়ের ব্যাপারে কি আর এ সব হালফ্যাসান খাটে? এখনও যে এলনা অসীম, বলদেখি কি চিন্তার কারণ হলো!

সুনলিনীর হাত ধরে বলেন—গোপার রাঙ্গাকাকার ভোর না হতে অফিস। ছেলেদের ইস্কুল—নানারকম তাড়া। আজ চলি ভাই। তবে তোমাকে বলি, এবার অসীমের বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে দিনক্ষণ দেখে পাকাদেখার ব্যবস্থাটা ক'রে ফেল। বিয়ের আর দেরী ক'রো না। হাজার হলেও বিয়ে বলে কথা। কথাবার্তা পাকা করে বসে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়।

সুনলিনীর ব্যাকুল চিত্ত সহসা যেন প্রতিভার কথায় সায় পায়। বলেন—সে কি আর আমিই বুঝিনা প্রতিভা? তবে শুনছে কে? তোমার ভাসুরকে এ সব কথা বোঝান কি আমার সাধ্য? বল কেন?

প্রতিভা মনে মনে হাসেন। তিনি কেন সকলেই জানেন, এ পরিবারে সকল বিষয়ে সুনলিনীর কথাবার্তা-ই হচ্ছে চূড়ান্ত বিধান। তার পর আর কারুর কোন কথা-ই খাটবে না। এ-ও তাঁরা জানেন

যে যখনই কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতি হয়, তখনই সুনন্দিনী এমনি করে সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দেন প্রকাশবাবুর ওপর।

প্রতিভা বলেন, এবার তাই কর মেজদি। আমি আজ চলি ভাই।

সুষমা-ও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বলেন—কি হলো বুঝতে পারছি না ত? অসীম ত এমন দায়িত্বহীন ছেলে নয়। রবি জামাইবাবুকে একটা ফোন করবি?

অরবিন্দ ভাবী কনে-র ভাই। সুনন্দিনীকে যদি কেউ ভয় না করে চলে, সে ঐ অরবিন্দ। সে বলে—বুঝতে পারছ না? একটা Suspense রাখতে চায় অসীমদা। সেইজন্যে-ই দেরী করছে।

সুষমা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। কেন যেন মনটা অস্থির হয়ে যায়।

এমনি সময় নেমে আসেন প্রকাশবাবু দোতলা থেকে। মুখে চোখে উত্তেজনা। বলেন—সাংঘাতিক কাণ্ড। ফোন এসেছে হাঁসপাতাল থেকে।

—হাঁসপাতাল থেকে?

—হ্যাঁ। এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে অসীমের।

—কি বললে?

—এ্যাকসিডেণ্ট করেছে অসীম।

—কি করেছে?

চিরকালের ধীর স্থির মানুষ প্রকাশবাবু আজকে চটে যান। চেঁচিয়ে বলেন—এ্যাকসিডেণ্ট। আমি চললাম হাঁসপাতালে। যাবে ত তৈরী হয়ে নাও। বৌদির গাড়ী কি আছে, না চলে গেছে?

সুষমা বলেন—আছে। চলুন।

বেরিয়ে যেতে গোপার কথা মনে হয় প্রকাশবাবুর। ফিরে আসেন। গোপার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বলেন.

—ভাবিস না। যাচ্ছি আমরা। ফোন করেছিলেন তোর মামা। তেমন কিছু নয়। মন খারাপ করিস না।

স্বামী এসেছেন হাঁসপাতালে আর ফোন করেছেন জেনে খুব নিশ্চিন্ত হন সুষমা। স্বামীর কর্মক্ষমতার ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। বলেন,

—জামাইবাবুকে জানানো হয়েছে ?

—হ্যাঁ। সুরেশবাবুও পৌঁছে গেলেন বলে।

সুরেশবাবু ভবানীপুরের বাড়ীতে নিজের ঘরে বসে ছিলেন আলো জ্বেলে। আজ মনটা বড় ভালো, বড় নিশ্চিন্ত লাগছিলো। সারাদিন ধরে শুধু এই সন্ধ্যাটির কথা-ই ভেবেছেন তিনি। যা-হোক, এতদিনে মনে হয় বিয়েটা লেগে যাবে। কতদিন, আজ কত বছর হয়ে গেল, বাড়ীটা তাঁর একটি কল্যাণময়ীর পদক্ষেপ বুকে কামনা করে তৃষিত হয়ে আছে। আজ কতদিন তাঁরা দুইজন শুধু সংসারে, আর কেউ নেই। বড় বড় ঘরগুলো, ভারী-পর্দার পেছনে যেন বোবা হয়ে আছে। অসীমের মা-র কত সাধ-স্বপ্নের সাজানো বাড়ী—ছাদে ফুলের বাগান—সব পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে। সেই এক সর্বনাশা সকালের পর থেকে কত বছর হয়ে গেল। ম্যাডক্স স্কোয়্যারের এই লালরঙের দোতলা বাড়ীখানা যেন সত্যিই ঘুমে ঝিমিয়ে থাকে। অসীম অফিসে বেরিয়ে যায় ন-টা বাজতে-ই। তারপর থেকে তিনি একা।

তাই বলে যে কাজ নেই তাঁর তা নয়। তাঁর নিজের অফিস-কামরায় মানুষজন আসেন। তাঁর স্কুল আছে দুটো, পাড়ার লাইব্রেরীটি-ও তাঁরই সহায়তায় আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠলো। স্কুলকমিটি ও লাইব্রেরীর সদস্যরা আসেন। সুরেশবাবু কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে। যাঁরা জানেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বলেন,

—এই বয়সে আপনার যেমন এনার্জি, যেমন কর্মক্ষমতা, এমনটি কিন্তু দেখা যায় না সুরেশবাবু। এতটুকু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, এ কি কম কথা।

সুরেশবাবু জবাব দেন না।

সুরেশবাবুর সম্পর্কে একদিন মানুষ অনেক আশা রাখতো। বরিশালের ছেলে সুরেশবাবু। চোদ্দবছর বয়সে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসেন কলকাতায়—গ্রামের কোনো সহৃদয় ধনীব্যক্তির আশ্রয়ে থেকে পড়াশোনা করেন। ছাত্রজীবনে সন্ধ্যাবেলা অন্নদাতা-র দোকানে কাজ করতেন। তাঁর পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ও সহনশীলতা দেখে ভদ্রলোক মুগ্ধ হলেন। তাঁর নিজের ছেলেরা মানুষ হয় নি। সুরেশকে ভালবেসেছিলেন পুত্রাধিক স্নেহে। সুরেশ যখন ইণ্টারমিডিয়েট পড়েন, তখন, সেই ভদ্রলোক সুরেশকে এক বিলাতী চটকলে শিক্ষানবীশের কাজে ঢুকিয়ে দেন। তিনি-ও পদ্মাপারের দেশের মানুষ—তাঁরও জেদ ছিলো। এক কথায় সুরেশকে পড়া ছাড়তে বললেন। বললেন,

—সাহেবরা এখনও কাজের মানুষ চেনে। এত কষ্ট করে আই. এ পাশ করে কি হবে বল? তুমি কাজ কর—একদিন ঠিক বুঝবে আমি কি মনে করে কাজে দিয়েছিলাম তোমাকে। আমি তোমার উপকার-ই করেছি—যদি বেঁচে থাকি, তোমার সে উন্নতি আমি দেখব-ই সুরেশ।

সুরেশ সেদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন।

তারপর থেকে সুরু হলো সংগ্রামের দিন। পরিশ্রম করে যে এত আনন্দ, তা জেনে সুরেশ যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। কাজটা-ই ভাল লাগতো, আর কোন কিছু, আর কোন কথা মনে থাকতো না। দ্বিতীয়দশকে সবে পা দিয়েছে বিংশ শতাব্দী।

তখন কাজের মানুষের দাম ছিলো। উদ্যোগী হলে ভাগ্যকে প্রসন্ন করা যেতো।

এমনি করে সুরেশের নিজের ব্যবসার গোড়াপত্তন হয়। সেদিন তাঁকে সকলে কর্মী ও উদ্যোগী বলে শ্রদ্ধা করতো। সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন সুরেশ।

আজ মনে মনে খতিয়ে দেখেন—অভিযোগ করবার খুব একটা কিছু নেই দুনিয়ার কাছে। বড়বাজারে ছোট লোহার দর জানবার সময়ে বুড়ো বেরী ওল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে একবার তাঁর মারামারি হয়েছিলো। হাতাহাতি নয়—মুখে। বেরী চ'টে বলেছিলো,

—তুমি বাঙ্গালী, তুমি ব্যবসার কি বোঝ? কলম চালানো ছাড়া আর কি পারো?

সাংঘাতিক ঝগড়া হয়। শেষে সুরেশ টেবিলের ওপর তাঁর কমিশনের টাকা আর বিল সব ফেলে দিয়ে চলে আসেন। বেরুতে যাবেন, এমন সময় বেরী এসে তাঁর হাত চেপে ধরলো। বললো,

—তুমি ত' সাংঘাতিক ছেলে? চলে যাচ্ছ অমনি? চলে যাবার কি হলো?

বেরীর চেহারাটা আজও মনে পড়ে সুরেশের। বেঁটে, লোমশ—শ্বেত ভাল্লুকের মতো চেহারা। হাতের কবজি-তে জোর ছিলো। ডান হাতের কবজিতে একটা ছোট্ট উল্‌কি ছাপ-ও মনে পড়ছে সুরেশের। ছোটবেলা না কি দুষ্টুমি করে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে সেই উল্‌কি দিয়ে এসেছিলো বেরী। পরে সে গল্প বেরী কতবার করছে, সুরেশের-ই বাড়ীতে ব'সে।

ঝগড়া করে-ই বেরী যেন বেশী বন্ধু হয়ে গেল সুরেশের। তারপর থেকে, যতদিন ছিলো এখানে—সুরেশের কাছে নিয়মিত আসতো। অসীমের প্রথম জন্মদিনে কুকুর ছানা এনেছিলো বাস্কেটে ভরে। অসীমের মা-র সামনে বসে ফরমায়েসী

ইলিশ মাছের তরকারী খেয়ে গিয়েছিলো বিলেত যাবার ঠিক আগে।

এমনি কতজনের ভালবাসা আর শ্রদ্ধা পেয়েছেন সুরেশ সারা-জীবন ধরে। সকলের কথা মনে পড়ে না। আবার যাদের কথা অনেকদিন ভুলে ছিলেন, স্মৃতির গহন থেকে মাঝে মাঝে তাদের মুখও প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনে

সেখানে কোনও অভিযোগ নেই সুরেশের। অভিযোগ যা আছে তা ঐ একজনের প্রতি।

সুরেশ এবার টেবিলের বাতিটা জ্বালেন। মৃদু স্নিগ্ধ আলোয় যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে সামনের ছবিখানা। গলায় সোনার হার চিকচিক করছে—মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানা একখানি স্নেহ মমতায় ভরা হাসি মুখ! পায়ের কাছে শাড়ীর কালো পাড় লুটিয়ে পড়েছে। এ ছবি অসীমের মা বেঁচে থাকতেই সুরেশের ভাগ্নে এঁকে ছিলেন। মামীমার একখানি প্রতিকৃতি আঁকবার বড় শখ ছিলো তাঁর। লক্ষ্মীর চরিত্র ছিলো স্নেহ-প্রবণ। স্নেহমমতা ও কল্যাণ, এই হৃদয় বৃত্তির মধ্যেই সহজে বিকশিত হতো তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁকে ভালবাসত সবাই। স্বামীর পরিবারের সকলের সঙ্গে-ই তাঁর মন ছিলো স্নেহের নিগড়ে বাঁধা। চিত্রকরও সেই স্নেহের প্রসাদে বঞ্চিত ছিলেন না। ছবিখানিতে তাই আশ্চর্য একটি জীবনের ব্যঞ্জনা এসেছে। স্নেহ ও প্রেম মিশ্রিত সেই চাহনি আর অধরে ক্ষীণ হাসির সুস্মিত রেখা, সবই হয়েছে প্রাণবন্ত।

আজ অনেকদিন পরে লক্ষ্মীর ছবির দিকে দেখছেন সুরেশ। মনের কোণায় কোথাও ঐ ছবির মানুষটির প্রতি একটা অভিমান আছে আজও। সব সময় চোখতুলে ঐ চোখে চোখে চান না। দেখে-ও না দেখার একটা ছলনা থাকে। সুরেশকে কোন চেষ্টা করতে না দিয়ে, কোন আভাস না দিয়ে এমনি করে সরে গিয়ে লক্ষ্মী

যে অন্যায় করেছেন, সুরেশ যেন তার-ই শাস্তি দিতে চান। আগে ও, রাগ হ'লে খবরের কাগজ তুলে ধরে নিজের মুখ আড়াল করে দেখে-ও না দেখবার ভাণ করতেন সুরেশ। এ যেন অনেকটা তেমনই কোন ছলনা। সামনে আছ তুমি, তবু তোমায় দেখতে পাচ্ছিনা—এ যেন সেই শিশুদের মতো আড়ি ক'রে সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপার।

আজ অবশ্য কোন অভিমান নেই। আজ সুরেশ বসে আছেন লক্ষ্মীর সামনে। মনে একটা প্রশান্তি। অসীম বলে গিয়েছে—আজ তুমি আমি একসঙ্গে খাব। তুমি যেন আমাকে রেখে খেয়ে নিয়োনা।

শুভসংবাদের খবর পাবেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে বসেছিলেন সুরেশ। সহসা তারই মধ্যে বেজে উঠলো ফোন। আর এমনই স্নেহ কাতর পিতার মন, যে ফোনটা হাতে তুলে নেবার আগেই সুরেশ যেন মনে মনে জানলেন যে অসীমের কোন বিপদ হয়েছে। বিপদের সম্ভাবনাটা মনটা একনিমেষে ভরে ফেললো। জলের ওপর ঢিল পড়ে যেন সৃষ্টি হলো একটা তরঙ্গের। আবর্তগুলো যেন মনের শেষ কোণাগুলোতে-ও ধাক্কা দিতে লাগলো।

অপরিচিত কণ্ঠে বেজে উঠলো—আপনি সুরেশ মৈত্র? আপনার ছেলে অসীম মৈত্র একটা এ্যাক্‌সিডেণ্টে আহত হয়েছেন। এমন কিছু নয়। আপনি ভাববেন না। তবে চলে আসুন। মেডিকেল কলেজ—এমার্জেন্সী। মেডিকেল কলেজ—এমার্জেন্সী।

ফোন ছেড়ে ঘণ্টার উপর হাত খানা পড়ে যায় সুরেশের। ঘণ্টাটা বাজতেই থাকে বিপদের এক সঙ্কেতের মতো। চাকর-বাকর-রা ছুটে আসে। বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে সুরেশবাবু বলেন, —বিশ্ব, তুই আমার সঙ্গে চল্। ড্রাইভারকে ডাক্। খোকার এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে।

গাড়িতে বসে স্থরেশবাবুর হাত দুখানা কেবল-ই ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন তিনি। যেন এ এ্যাক্সিডেন্ট সামান্য-র উপর দিয়ে যায়। যেন বেশী কিছু না হয়। কোথায় মায়ের সেই আশীর্বাদ? এখন তা যেন রক্ষাকবচ হয়ে ঢেকে রাখে অসীমকে। অসীমের কোন ক্ষতি যেন না হয়।

নিজেকে অসহায় মনে হলো স্থরেশের। নিজের উপর কোন ভরসা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

অসীমকে দেখে মুখে আর কথা সরে না স্থরেশের। চেয়ে-ই থাকেন শুধু।

ডাক্তারকে পুলিস ইন্সপেক্টার বলেন—ঐ রকম বড় একটা মোড়ের মাথায় এ্যাক্সিডেন্ট হলো, তাতেই বেঁচে গেলেন ভদ্রলোক। ছোট খাটো গলিতে হলে, মারতে মারতে মেরে ফেলে ড্রাইভারকে। এ ভদ্রলোকের তেমন কোন injury হয়নি। ভাগ্যে এসে পড়ে ছিলাম। অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে।

—অল্পের ওপর দিয়ে যে গিয়েছে, সেটা-ও আশ্চর্য। চিরদিনের মতো কোন ক্ষতি হবে না—তবে চোখটা বেঁচে গিয়েছে অল্পের জন্য।

ডাক্তার ইন্সপেক্টার এমন নিস্পৃহ ভাবে কথা বলেন অসীম সম্পর্কে, যে ভাল লাগেনা স্থরেশের। তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। এমার্জেন্সী ওয়ার্ড থেকে কেবিনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন অসীমকে। এর তার মুখ থেকে সংগ্রহ করেন দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত। বলেন—অসীম ত' বহুদিন থেকেই গাড়ী চালাচ্ছে, এমন অসাবধানে ত' কোনদিন চালায় না। এমন কেন হলো?

ইন্সপেক্টার বলেন,

—ওঁর হয়তো সত্যিই খুব দোষ ছিলনা। আমার সেইরকমই ধারণা। অবশ্য এখনো কিছু বলা যায় না।

—সে ভদ্রলোকের কি হলো? কেমন আছেন?

—কোন আশা নেই।

—আশা নেই?

—না মশায়—

ডাক্তার বলে চলেন—পিঠের রিব ভেঙ্গে দু'দিক থেকে lung-এ ঢুকে গিয়েছে—ও আর দেখবার কি আছে বলুন?

—কিন্তু ডক্টর, ব্লাড দিতে হয় দিন যা প্রয়োজন করুন—তা বলে মানুষটাকে বাঁচানো যাবে না?

এমনি ধারা প্রশ্নের সম্মুখীন কেবলই হতে হয় ডাক্তারদের। ডাক্তার কৌতূহল শূন্য চোখে সুরেশকে দেখেন। বলেন—আপনি হয় তো বলতে চাইছেন, যে খরচটা কোন প্রশ্ন নয়। কিন্তু টাকার দিকে চেয়ে কি এমার্জেন্সীর রুগীকে ট্রিট করি আমরা? যা প্রয়োজন সবই করা হয়েছে। ভদ্রলোক কোন কিছুই করতে দেননি আমাদের। আনতে না আনতে হয়ে গিয়েছে।

সুরেশ হতাশ হয়ে যান। বলেন,

—আজ তার বিয়ের এন্‌গেজমেণ্ট। কত বড় শুভদিন একটা। বেরুলো খুসী মনে গাড়ি নিয়ে। মাঝপথে এ কি দুর্ঘটনা!

—আহা, আপনার ছেলেও জানতেন না—ভদ্রলোকও প্রস্তুত ছিলেন না—সেইজন্যেই ত' এটা দুর্ঘটনা। নইলে একে ত' খুন বলতো!

প্রকাশ, সুনলিনী, সুষমা—সবাই এসে পড়েন। কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জটলা হয়। সুষমার স্বামী এসে পড়াতে আবহাওয়াটা খানিকটা উচ্চকিত হয়। বরেনবাবু পুলিসী চাকরীতে বেশ ওপর তলায় এসেছেন। সিঁড়ি টপকে টপকে উঠেছেন, তাই তাঁর উন্নতিটা অনেকের চক্ষুশূল। ডিউটি থেকে সবে ফিরে ছিলেন বাড়ীতে—তাই ইউনিফর্ম-ই এসেছেন। উচ্চপদের সে চিহ্ন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন ইন্সপেক্টার।

বরেনবাবুকে দেখে সুরেশবাবুও যেন আশ্বাস পান। বরেনবাবু পাশে এসে দাঁড়ান। বলেন,

—ভাবছেন কেন? খোকার ত' তেমন কোন দোষই নেই। এ কেসে কিচ্ছু হবে না। এমন কি তিনচার মাসের জন্যে License পর্যন্ত Surrender করতে হবে না—হয় তো···তাই মনে হচ্ছে।

অসীমের জ্ঞান ফিরে আসে আরও পরে। সারা শরীরে টনটনে একটা ব্যথার বোধ—আর মনে হয়, জলের অনেক তলা থেকে সে যেন ওপরের দিকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে। উঠতে উঠতে যেমন বুক থেকে ভারটা কমে আসছে, আবার সেই সঙ্গে একটা নতুন অনুভূতি। এই পাষাণ ভারটা একদিকে যেমন বুকটা চেপে রেখেছিল, তেমনই অন্যদিকে অন্যান্য অনেক যন্ত্রণার বোধকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। এখন ভারটা কমে যাচ্ছে বটে, কিন্তু যন্ত্রণার বোধটা যেন নতুন করে জেগে উঠছে। সেই সঙ্গে একটা প্রশ্ন।

সুরেশের দিকে চেয়ে প্রথমটা অবিশ্বাস, তারপরে একটা আশ্বাসের স্বস্তি ফুটে ওঠে চোখে মুখে। অস্ফুটে সে বলে,

—বাবা?

—কি বাবা?

—সেই ভদ্রলোক?

চট্ করে জবাব দিতে পারেন না ডাক্তার বা সুরেশ। চোখে চোখে তাকান দু'জনে।

অসীম আবার বলে,

—কি হলো বাবা?

সুরেশ ঝুঁকে পড়েন। বলেন,

—ভালো আছেন। তেমন কিছু হয়নি। তুমি ভেব ন
খোকা। তোমার মেসোমশায় এসেছেন। সব দেখছেন
ভেবনা তুমি।

একটা অসহায় মানবদেহ, আর আরো অনেক অসহায় একট
ঝুলে পড়া হাতের ছবি বিঁধতে থাকে অসীমের মনে। তা
চেতনায় যেন তপ্ত ছুরি দিয়ে এঁকে দিয়েছে কেউ সে ছবি।

এবার বরেনবাবু এগিয়ে আসেন। আজ অনেকদিন ধ
অসীম তাঁর শুধু স্নেহাস্পদই নয়, বন্ধুও বটে। তাঁর মনে হয়
অসীম বুঝি নিজের কি বিপদ হবে, সেই কথাই জানতে চাইছে
বলেন,

—আমি আছি। তুমি ভাবছ কেন অসীম ?

অনেক কথা বলতে পারে না অসীম। বলতে পারে না,
নিজেকে তার মনে হচ্ছে হত্যাকারী। দুর্ঘটনা যে তাতে কো
সন্দেহ-ই নেই। কিন্তু একটা মানুষের জীবন যে চলে গেল, ব
পঙ্গু হয়ে গেল চিরতরে—সেটা অনেক রূঢ় সত্য। না হ
ভবিতব্য-ই। তবু তার হাত দিয়েই ত' হলো ঐ দুর্ঘটনা। ত
তার অপরাধের কমতি হলো কোথায় ? তার সান্ত্বনা-ই
কোথায় ? বাবার দিকে আবার চায় অসীম। বাবা তাকে আশ্ব
করেন। বলেন,

—কিছু ভেবনা।

অসীমের আঘাত তেমন গুরুতর নয়—আর দুর্ঘটনায় অসীমে
তেমন দোষ ছিল না। এইটুকু জেনেই বরেনবাবুর মনটা হালক
হয়ে যায়। বাইরে এসে সুরেশকে কাছে টেনে তিনি বলেন—

—ভাবছেন কেন ? কিছু হবে না। কেস্ দাঁড়াবে না।

—বলছো ?

—নিশ্চয়। তা ছাড়া এই ইন্সপেক্টরও ত' বলছে

ভদ্রলোকের অসাবধানতা-ই দায়ী। ভালো কথা, ভদ্রলোকের বাড়ীর ঠিকানা পাওয়া গেছে? খবর গিয়েছে বাড়ীতে?

—হ্যাঁ। ইন্সপেক্টর বলেন,

—হাতে একটা পকেট বুক ছিলো। তার থেকে পাওয়া গেল নাম-ঠিকানা। মনে হয় ছেলের খোঁজে যাচ্ছিলেন। ছেলের নাম-ঠিকানা, ১২সি বাসের কথা, এইসব লেখা ছিল।

বরেনবাবু বলেন—বুঝেছি। ঐ বাস সম্পর্কে সবিশেষ জানেন না। হঠাৎ যেই দেখেছেন, অমনি রাস্তা পেরোতে চেষ্টা করেছেন। এমনি কেস্ তো হরদম হচ্ছে। সেদিনই শেয়ালদ'য়·······

ভাবনার কোন কারণ আর নেই। তবু ভদ্রলোকের কথা মনে হয় সুরেশের। মনটা বিশ্রী হয়ে যায়।

॥ তিন ॥

হাসপাতাল থেকে তিনদিন বাদেই ছাড়া পেলো অসীম। চলে এলো বাড়ীতে।

শরীরের আঘাত সহজেই সারলো, কিন্তু মনটা রইলো জখম হয়ে। স্নায়ুমণ্ডলীতে বয়ে গিয়েছে ঝড়—পায়ের তলায় নেই মাটি। স্বস্তি নেই, শান্তি নেই—ঘুম নেই—অসীমের মনটা যেন একটা রক্তাক্ত কবন্ধ। শরীর থেকে ত' মনটাকে বার করে তাড়িয়ে দিতে পারে না অসীম। অথচ মনের সে রক্ত ক্ষরণের যন্ত্রণার হাত থেকেও তার মুক্তি নেই।

ছেলের এ ভাবান্তর দেখে সুরেশও কম চিন্তিত নন। হ্যাঁ, হয়েছে একটা অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা। কি করা যাবে! হঠাৎ হয়-মানুষকে প্রস্তুত হবার কোন অবকাশ দেয় না—সেইজন্যেই তার নাম দুর্ঘটনা।

সে দুর্ঘটনার সকল নৈতিক দায়িত্ব নিজের ওপরে তুলে নিয়ে যে কষ্ট পাচ্ছে অসীম—সে কথা সুরেশ বোঝেন। কিন্তু বুঝেও যেন বোঝেন না। যেন যুক্তি খুঁজে পাননা মনে মনে। তাঁর মনে হয়, এতটা চিন্তা না করলেও পারে অসীম।

কখনো মনে হয়, এই ঘটনার পরিণতির কথাই বুঝি চিন্তা করছে অসীম। কিন্তু সে কথাই বা অত করে ভাববার তার কি প্রয়োজন? এক এক সময় সুরেশ বলেন,

—তুমি মিছিমিছি অত ভাবছ। অত দুশ্চিন্তা করবার কি আছে?

—কই, দুশ্চিন্তা ত' আমি করছি না।

—আমি দেখতে পাচ্ছি—দিনরাত তুমি সেই কথাই ভাবছ।

—কে বললো ?

কথাটা বলেই অসীম উঠে যায় বাবার সামনে থেকে। কিছুক্ষণ াদে সুরেশ দেখেন—কপালের ওপর বাঁ হাতটা রেখে, বসে আছে সীম টেবিলে; ডান হাতে দুই আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট অমনিই ুড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারেন—নিজের অন্ধকার চিন্তাগুলোর নিচে ব দিয়ে বসে আছে অসীম। এখন আর তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা হবে।

ভালো লাগে না। ভালো লাগে না, যে এই এক জায়গাতে ার আর অসীমের মধ্যে এই পার্থক্যের পারাবার রচিত হয়েছে। মস্ত কিছুর উপলক্ষ্য যে, সেই ভদ্রলোকের কথাও অনেক সময় নে হয় তাঁর।—আজকালকার মানুষের রাস্তাঘাট সম্পর্কে বোধ নই—এই মন্তব্য আজকাল মাঝেমাঝেই শোনা যয়ে সুরেশের মুখ থেকে

তিনি যতই চেষ্টা করেন, ছেলে কিছুতেই সহজ হয় না। এবং সই সরল প্রীতির লেনদেন সম্ভব হয় না দু'জনের মধ্যে। এর জন্য াঝে মাঝে সুরেশের ছেলের ওপর খুব রাগ হয়। মনে হয়, তাঁর পরেই অযথা অন্যায় করছে অসীম।

তিনি তখন স্কুলের কথা নিয়েও এ কাজ সে কাজের কথা তুলে াবুঝ হয়ে ওঠেন। বলেন,

—কই, তুমি ত এখন স্কুলের কাজে কোন ইন্টারেস্ট নিচ্ছ না ? তোমার বড় অন্যায়, অসীম। কেন স্কুলে আমি ছেলেদের জন্যে থ চলবার নিয়মকানুন শেখাবার লোক আনছি, জাননা ? পুলিশ াকে ডেমনস্ট্রেটার পাঠিয়ে দিচ্ছে আমার কাছে।

—তাতে আমি কি করব ?

—বা, এটা যে ভাল কাজ, তা স্বীকার কর ত ?

—নিশ্চয়।

আবার চুপ করে গেছে অসীম। তারপরে আর কেম: করে কথা টেনে আনেন সুরেশ? তাঁর মনে হয়েছে, ছেলে ব: হয়ে যাওয়া মহা জ্বালা। এতদিন যে বন্ধুর মতো সহজে মিশেছে— আজ সে সামনে বসেও একেবারে সুদূর হয়ে আছে। ভালে লাগে না সুরেশের।

তার এ ভাবান্তরে যে বাবাও ব্যথিত হয়েছেন, অসীমের সে স: কথা মনে নেই। সম্প্রতি সে নিজেকে ছাড়িয়ে আর কিছু দেখতে বা ভাবতে পারছে না। বিমূঢ় চেতনার অন্ধ ও জটিল কতকগুলে জটের মধ্যে সে অসহায়ভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়ছে। বেরিয়ে আসতে পারছে না, এবং থেমে আছে সেখানেই।

তার নিজের মনটা যে এমন অন্ধ একটা বিবর, তা (আগে জানেনি। আজ নিজের সে অজ্ঞাত পরিচয় জেনেও (বিভ্রান্ত।

পিতা ও পুত্রের এ ঘনি? বন্ধুত্বের মাঝখানে সেতু রচনা ক আছেন অসীমের মা। অসীমের মার কথাই আজ বারবার ম হয় সুরেশের। তিনি থাকলে অনেক জটিলতাও সহজ হতো- অনেক কিছুই তিনি শোভন ও সুন্দর করে নিতে পারতেন সে ক্ষমতা তাঁর ছিল।

অসীমের মার নাম ছিল লক্ষ্মী। লক্ষ্মী নামটির প্রস: সুরেশের ছোট কাকা বারবার বলতেন—নামটি যেন মানুষটি: পেয়ে ধন্য হয়েছে। এমন যোগ্য মানুষের যোগ্য নাম আ কখনো শুনিনি।

কি পিতৃগৃহে—কি পতিগৃহে—সকলের স্নেহ-ভালবাসা পাবা ভাগ্য ছিল লক্ষ্মীর। সৌভাগ্য ত' একভাবে হয় না। সৌভাগ্যে

সংজ্ঞা বহুবিধ। অনেক মানুষের স্নেহ-ভালবাসা প্রীতি ও শ্রদ্ধা যদি সম্পদ হয়, তবে লক্ষ্মী সে সম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন।

সুরেশের ঘরে আসবার পরে লক্ষ্মীকে অনেকগুলি মা-মরা ছেলেমেয়ের ভার নিতে হয়েছিল। সুরেশের বোন মারা গেলেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলেন লক্ষ্মী। সুরেশের ছোটকাকা স্ত্রী মারা যেতে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লেন। অঞ্জনা ছিলো জেদী—আবদার করতো। রাতে লক্ষ্মীকে জড়িয়ে কাঁধে মুখ গুঁজে ঘুমোত।

লক্ষ্মীর নিজের ছেলে অসীম এদের চেয়ে ছোট। অসীমের চেয়ে এদের তিনি কোনদিন তফাৎ করে দেখতেন না। ছোটকাকা বিলেতে গেলেন দুই বছরের জন্যে। অঞ্জনা রইলো লক্ষ্মীর-ই কাছে।

এখনো মনে পড়ে সুরেশের—কি রকম আনন্দ করে সব কাজ করতেন লক্ষ্মী। এতগুলি ছেলেমেয়ে-কে দেখাশোনা করা, স্কুলে পাঠানো—টিফিনের ব্যবস্থা করা, কত কাজ ছিল তাঁর।

কিন্তু সকল কাজের মধ্যেও সুরেশের দিকে—তাঁর সকল সুখ সুবিধার দিকে ঠিক নজর থাকতো লক্ষ্মীর। বিকেল বেলা—ছেলে-মেয়েদের পার্কে পাঠিয়ে রান্নাঘরের দেখাশোনার কাজ সেরে লক্ষ্মী নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে এসে বসতেন বাইরের বারান্দায়। মোড়াপেতে বসে দেখতেন গাড়ী ফিরছে কি না। তখনো হাত দু খানির বিশ্রাম ছিল না। ছেলেদের সার্টের বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছে—খেলতে গিয়ে মোজা ছিঁড়ে এনেছে অসীম—এইসব মেরামতের কাজ নিয়ে বেতের ছোট টুকরিটা ভরা থাকতো। হাত চলতো কাজ করে—আর চোখ থাকতো পথের দিকে। গেট দিয়ে গাড়ী ঢুকতে না ঢুকতে ত্রস্তে ব্যস্তে উঠে পড়তেন তিনি।

তারপর বসে ঘণ্টাখানেক সুরেশের সঙ্গে কাটাতেন। কি যে

নির্ভর করতে শিখেছিলেন সুরেশ—অফিসে কি হলো না হলো—সব খুঁটিনাটি যেন লক্ষ্মীকে না বললে হতো না। কোন্ ডিরেক্টর কি বললো—উড়িষ্যার সে অর্ডারটা কেন নষ্ট হয়ে গেল—সব বলতেন!

এই সময় ছেলেমেয়েরা পার্ক থেকে ফিরে চলে যেতো যে যার কাজে। এ সময় লক্ষ্মীকে বিরক্ত করবার হুকুম ছিলনা কারো। ছেলেমেয়েরা হাত পা ধুয়ে জামাকাপড় বদলে রান্নাঘরে ঠাকুরের কাছ থেকে চেয়ে এক একবাটি দুধ খেয়ে যে যার মতো পড়বার ঘরে চলে যেতো। অসীম-ও দাদাদিদিদের সঙ্গে-ই একসঙ্গে ফিরতো। তারবেলা লক্ষ্মীর পক্ষপাতিত্ব ছিলনা কোন। শুধু এই সময়টা—পড়তে যাবার আগে—একবার সে বাবার কাছে এসে দাঁড়াতো। বাবা আর ছেলের এ সময়টা নইলে আর কোন সময়ই দেখা হয় না—তাই অসীমকে এতটুকু অধিকার দিয়েছিলেন লক্ষ্মী।

সেই সব ছেলেমেয়েরা লক্ষ্মীকে ছেড়ে যাবার সময় কি রকম চোখের জল ফেলে গিয়েছে। এক একজন বড় হয়েছে, এক একজন ক'রে সরে গিয়েছে। কিন্তু মনথেকে এতটুকু সরে যায়নি। বিপদে সম্পদে, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে—উৎসবে বা বিনাকারণে বারবার তারা এসেছে লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীর ব্যবহারে কোনদিনও মনেহয়নি যে, তারা তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে নয়।

অঞ্জনার কথা আলাদা। মা-কে হারিয়ে বৌদিদি-কে সে পেয়েছিল। মার চেয়েও বৌদিদি-কে সে পেয়েছে বেশীদিন ধরে। ছোটকাকা ফিরে এলে-ও অঞ্জনা প্রথমে যেতে চায়নি। তখন বড় হয়েছে—বেথুনকলেজে পড়ছে। কিন্তু ঐ অতবড় আঠারো বছরের মেয়ে কলেজ পালিয়ে চলে আসতো লক্ষ্মীর কাছে। বলতো —টেলিফোন করে দাও বাবাকে—শরীর একটুও ভাল লাগছে না

আমার। যেতে ইচ্ছে করছে না। কালকে একেবারে কলেজ করে তবে বাড়ী ফিরব।

তারপর দিনও তার যেতে ইচ্ছে করতো না। অন্য একটা ছুতো মনে পড়তো। রাত হলে লক্ষ্মী আর সুরেশ দুইজনে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতেন তাকে।

অঞ্জনার বিয়ে-ও লক্ষ্মী-ই দিয়েছিলেন! লক্ষ্মী যখন চলে গেলেন, তখন ঐ অতবড় মেয়ে—নিজেও তখন দুটি ছেলের মা—মাটিতে পড়ে পড়ে তিনদিন ধরে কেঁদেছিল।

অঞ্জনার পরেই লক্ষ্মীকে আঁকড়েছিলো সুরেশের বোনের ছেলে সৌরভ। সে যে ছবি আঁকতে পারে, বা পারবে—সে বিষয়ে কি সৌরভের বাবা কি সুরেশ—কারু-ই সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। লক্ষ্মী-ই তাকে রঙ দিয়ে তুলি দিয়ে—নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। আর্ট কলেজে সে ভর্ত্তি হয় সে-ও তাঁর-ই জেদে।

এখন সুরেশের মনে হয়—ভাগ্যে সৌরভ আঁকতে শিখেছিলো, তাইতো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লক্ষ্মীর ঐ ছবিখানি আঁকা। যার ছবি, আর যে এঁকেছে—দুজনের ভালবাসা মিলেমিশে গিয়েছে, তাই ছবিখানা অমন প্রাণবন্ত হয়েছে। কই, তেলরঙে প্রতিকৃতি ত সৌরভ কতই এঁকেছে! এরকম সুন্দর ত' একখানিও হয়নি।

সকলের দায়ভার নিজের উপর টেনে নেবার স্বভাব লক্ষ্মীর চিরদিন-ই ছিল। সুরেশ কত সময় বলেছেন—

—তুমি এমন করে আর কত জনকে দেখবে? তোমার নিজের শরীরের দিকে নজর থাকেনা—তোমার উপর যে বড্ড অত্যাচার হয় লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী সুরেশের সব কথাই শুনতেন, কোন কথা-ই উপেক্ষা করতেন না। তবে সে শোনার মধ্যেও খানিকটা স্নেহ আর ক্ষমা

মেশানো প্রশ্রয়ের ভাব লেগে থাকতো। সুরেশের কথা শুনে ঈষৎ মিষ্টি হেসে তিনি বলতেন—

—কি করবো বল? দায়িত্ব এসে পড়লে চুপ করে কি থাকা যায়?

প্রতিবেশীদের প্রতি-ও কম দায়িত্ব ছিলনা লক্ষ্মীর। বাড়ীর পেছনে ধোপাদের বাড়ি। তাদের সঙ্গেই কি লক্ষ্মীর কম সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো? তাদের মেয়ে-বৌ-মা ছেলের অসুখে, নিজেদের প্রয়োজনে, নিঃসঙ্কোচে উঠে আসতো তাঁর বাড়ীতে। রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বসে যখন তরকারী কুটতেন লক্ষ্মী, তখন এসে বসতো তারা উঠোনে। বই পড়ে পড়ে লক্ষ্মীর হোমিওপ্যাথি ওষুধ সম্পর্কে বেশ জ্ঞান হয়েছিলো। বলতেন,

—কি রুকমিনী, তোর ছেলের কি হলো?

—কিছু খেতে চাইছেনা মা জী, পেটের ব্যথায় শুধু কাঁদছে।

অঞ্জনাকে ডেকে লক্ষ্মী বলতেন,

—আমার ওষুধের বাক্সটা নিয়ে আয়তো অঞ্জু—ওষুধ দে ওকে।

নিচের ঘরে তাকের ওপর লক্ষ্মীর একটি ছোট খাটো ডিস্‌পেন্সারী গোছানো থাকত। আয়োডিন, তুলো, ব্যাণ্ডেজ, প্ল্যাস্টার, মলম, আরো টুকিটাকি ওষুধ। সুরেশের ছোটকাকা আর সুরেশ মিলে যা হাসাহাসি করতেন। কতদিন ছোটকাকা বলেছেন,

—বৌমা তুমি এবার আমার চেয়ারে মাঝে মাঝে ব'সো। আমি তাহলে একটু ছুটি পাই।

প্রত্যেকের কথার জবাবে একটু মিষ্টি হাসা ছিলো লক্ষ্মীর স্বভাব। বলতেন,

—বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের কিছু হ'লে কথায় কথায় কি

ডাক্তারের কাছে ছুটতে পারি? আর আমার ডিসপেন্সারীতে সবচেয়ে দরকার কার, তা জানেন ত? যে শান্ত মেয়েটি আপনার

অঞ্জনা হাতে পায়ে দুরন্ত—ভাগ্নেদের সঙ্গে একসঙ্গে হকি খেলবে—একসঙ্গে ক্রিকেট খেলবে—সাইকেল চড়তে যে শিখছে তা জানতেন না লক্ষ্মী। পার্কে গিয়ে সে ছেলেদের বলতো,

—তোরা ধরে স্টার্ট দিয়ে দে—আমি একটু চড়ি।

সত্যি, ছেলেদের চেয়ে অঞ্জনার অনেক বেশী হাত পা কাটতো। সাইকেল শিখতে গিয়ে যেদিন সে হাত পা কেটে এলো বাড়ীতে—লক্ষ্মী তাকে বকবেন ব'লে দাঁড়িয়েছিলেন—কিন্তু অঞ্জনা আগেই এলো কাঁদতে কাঁদতে। ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে গিয়েছে—চোখের উপর হাতচাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে আগেই সে লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরলো—আমার পা কেটে গেছে। আর কোনদিন যাবনা বৌদি বড্ড লেগেছে।

আর তাকে বকতে পারলেন না লক্ষ্মী।

আজ সুরেশের মনে হয়—সেই সব মানুষগুলি লক্ষ্মীকে কি রকম চিনেছিলো। বুড়ো ভগবতীধোপা—দুইকানে তার রুপোর মাকড়ি—মাথায় পাগড়ি বাঁধা। রোজ কাজ থেকে ফেরবার সময় একবার এসে দাঁড়াতো নিচে। বলতো

—মা-কে দরশন করে যাব।

তাদের সুখ-দুঃখে লক্ষ্মী গিয়ে দাঁড়াতেন। ঐ ভগবতীর নাতি বাজি পোড়াতে গিয়ে আগুনে পুড়ে গিয়েছিলো। বস্তি-তে তখন পুরুষরা কেউ নেই। লক্ষ্মী বিশ্বনাথকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে তাকে নিয়ে যান হাসপাতালে। যতদিন সে হাসপাতালে ছিল, লক্ষ্মী তার মা-র হাত দিয়ে ফল মিষ্টি পাঠিয়ে দিতেন।

আবার উপযুক্ত ছেলে মরে গেলে ঐ ভগবতীধোপা যেদিন ষোলোবছরের নাতির হাত ধরে মাতাজী বলে কেঁদে এসে পড়েছিল

—সেদিন ঐ লক্ষ্মী-ই সুরেশকে বলে কয়ে সেই বালককে চাকরি করে দিয়েছিলেন সুরেশের অফিসে। বলেছিলেন,

—ভগবতী বুড়ো হয়ে গিয়েছে আর কাপড় কাচতে পারে না। ছেলেটার ডানহাতটা জানতো পুড়ে কি রকম হয়ে গেল। নাম টাম লিখতে পড়তে পারে—দাওনা ওকে একটা কাজ। তোমাদের ত' কতরকম কাজ-ই আছে।

গৃহিনী-সচিব-মিত্র এবং প্রিয়সখী—লক্ষ্মী জানতেন তাঁর একটি কথা-ও উপেক্ষা করবেন না সুরেশ।

সুরেশের সহকর্মীরা-ই কি কম ভালবাসতেন লক্ষ্মীকে? তাঁর পরিবারের এ্যাটর্নী বুড়ো নরেন মুখুজ্যে লক্ষ্মীকে বলতেন,

—ছেলেটা আসুক বিলেত থেকে—তার জন্যে তোমার মতো একটি মেয়ে দেখে দাও।

—আমার মতো কালোমেয়ে? কাকাবাবু আপনার ছেলের জন্যে কত সুন্দর মেয়ে আসবে।

—তোমার মতো কি আর পাব? তবে অমন মনপ্রাণের ছিটেফোঁটা-ও যদি থাকে—তবে সে মেয়ে এলে আমার ঘর আলো হয়ে উঠবে। আর কে বলেছে তুমি কালো?

লক্ষ্মীর রঙ ঠিক গৌরবর্ণ ছিল না। শ্যামল আর স্নিগ্ধ। কিন্তু সুরেশের মনে হতো এই-ই হলো সবচেয়ে সুন্দর। তিনি বলতেন,

—কি জান, এর চেয়ে আর এতটুকু ফর্সা হলে তোমায় যেন মানাতনা।

লক্ষ্মীর ছোটবোন সুষমা কত ঠাট্টা করেছেন সুরেশকে। বলেছেন,

—দিদি কি করেছিলে জামাইবাবুকে? আমার রঙ যে সকল ভাইবোনের মধ্যে ফর্সা, কই—আমি ত' একদিনের জন্যে প্রশংসা পেলাম না। না শাশুড়ীর কাছ থেকে, না তোমার ভগ্নীপতির

কাছ থেকেই তোমার বাপু চিরদিন প্রশংসা পাবার ভাগ্য, দেখছি ত।

লক্ষ্মী হাসতে হাসতে বলতেন,

—তুই ওঁদের কথা শুনিস্ কেন? তোর জামাইবাবু আমাকে ঘুঁষ দেন। বুঝলিনা? সংসারটা আমার হাতে—সব দায়ভার আমার ওপর—মাঝে মাঝে ঘুঁষ না দিলে কি চলে? তাই ঐ প্রশংসাটুকু।

এমনি করে যে মানুষটা সকলকে ভালবেসে—সকলের ভালবাসা পেয়ে—এমন প্রয়োজনীয় হয়েছিলো সংসারে—যাকে ঘিরে এতজন মানুষ আনন্দ ক'রে বাঁচতো—তাকেই ভগবান এমন করে সরিয়ে নিলেন কেন—তা আজ-ও বুঝতে পারেন না সুরেশ। আজ, সে ঘটনার দশবছর বাদে-ও সে কথা মনে করতে গিয়ে সব ভুল হয়ে যায় তাঁর। পাইপ জ্বালাতে ভুল হয়ে যায়। নিভে যাওয়া তামাকগুলো পিন দিয়ে খুঁচিয়ে ঠিক করে নিতে গিয়ে হাতটা থেমে যায় মাঝপথে। আজ-ও ভাবতে পারেন না সুরেশ—কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

সেদিনকার প্রতিটি ঘটনা ছবির মতো লেখা আছে সুরেশের বুকে।

তখন তাঁর বড্ড কাজের সময়। ডিরেক্টার বোর্ডের কন্‌ফারেন্স চলেছে। সকালে বেরিয়ে যান সুরেশ ফিরতে বেজে যায় রাত দশটা। বুকে ব্যথা আর সামান্য কাশি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছেন লক্ষ্মী দিন কয়েক ধরে। সুরেশের ছোট কাকা আসেন—দেখে চলে যান। সুরেশ সকালে বেরুবার আগে বিশ্বনাথকে ডেকে হৈ চৈ করেন,

—মা-কে ওষুধ খেতে বলবি—নিচে যেন বেশী নামেন না—দেখবি। খাবার সময় বা নামবার দরকার কি? ওপরে খাবার দিতে বলবি।

—কেন তুমি এত কাজের মধ্যে-ও আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছ, বল ত? আমি ঠিক ওষুধ খাবো—বিশ্রাম নেব, সব করবো।

বাড়ীতে তখন কেউ থাকে না। অসীমের বয়স সতেরো হবে দিন সাতেক বাদে। কেম্ব্রিজ শেষ হয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে চারদিনের জন্যে বাইরে যাবে অসীম। তবু লক্ষ্মীর এবার যে কত দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ হলো। বললেন,

—চার জোড়া মোজা রইলো সঙ্গে। ভুলে-ও যেন ভিজে মোজা পরে থেক না।

—মা তুমি এমন করছো, আমি যেন ছোট ছেলে। এতটুকু জ্ঞান নেই আমার।

—না, তুমি মস্ত বড়ো হয়েছো। ক-বছর হয়েছে বলতো? সেই যে ভিজে মোজা পরে খেলা করে জ্বর নিয়ে এলি? মনে নেই?

—সে তো কবেকার কথা। ক্লাস এইটে কি করেছিলাম, তুমি আজ-ও আমায় সেই কথা শোনাবে?

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ গোছগাছ করলেন। তারপর আবার কি মনে পড়ে গেল। বললেন,

—শোন্, গরম গেঞ্জীটা সঙ্গে দিয়ে দিলাম। পরে নিস্ কিন্তু, যদি ঠাণ্ডা লাগে। বলা ত' যায় না।

তখন সুরেশ হাসতে হাসতে বলেছেন,

—ওগো, সেখানে মোটে শীত নেই। ঠাণ্ডাটা লাগলেই হলো? কেন তুমি ও বেচারাকে ভার চাপিয়ে দিচ্ছ? চলে যাক্‌না সামান্য জামাকাপড় নিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরবে ফিরবে—বেড়াবে—কি হয় ঠাণ্ডা লাগলে? ওর বয়সে আমি কত কষ্ট করেছি, জান না তুমি? ওতে ছেলেদের কিছু হয় না।

লজ্জা পেয়ে লক্ষ্মী হেসেছেন। বলেছেন,

—সেবার ছেলেদের সঙ্গে গিয়েছিল না স্কুল থেকে? ঠাণ্ডা লাগিয়ে কিরকম জ্বরটা বাধিয়ে এলো বলতো?

—মা, সে হলো নভেম্বর মাসে কাশ্মীর। এটা হলো সেপ্টেম্বর মাস। জায়গাটা হলো পুরী। কি মুস্কিল, সমুদ্রের ধারে শীত পড়ে কখনো? ভূগোল বলে তো কোন একটা বস্তু আছে। ভূগোল ছেড়ে ত' আর পুরী-ও বাইরে যেতে পারে না।

—ঐ তো, আমি বলিনি তখন? যে নভেম্বরে কাশ্মীর কেউ যায় না?

অসীম হতাশ হয়ে নোটবুক বের করে বসেছে খাটের ওপর। বলেছে,

—তুমি মোটে লজিক বোঝ না, তার কি হবে? বেশ টুকতে বসলাম। বল, আর কি কি নেব? কবিরাজী সালসা, মাফলার, খলনোড়া, ব্রায়োনিয়া।

পোশাক পরে নেমে আসতে আসতে সুরেশ অসীমের কথার শেষটুকু শুনে হাঁ হাঁ করে উঠেছেন। বলেছেন,

—কক্ষনো এই সব বাজে মালপত্র নেবেনা খোকা। তোমার মার ঐ সব কাণ্ড। অফিসের কাজে বোম্বে যাচ্ছি পোর্ট ফোলিও থেকে বেরুলো নির্মাল্যের মোড়ক। ভিটামিন ট্যাবলেট—আরো কত কি! ওসব নিয়ে কি ঘোরা ফেরা যায়?

—তা বললে ত' হবে না; যদি ঠাণ্ডা লাগে, তাহ'লে পাঁচন খেতে হবে। যদি সর্দি হয় তবে সব ছেলেরা সমুদ্রে স্নান করবে, আমি মাফলার মাথায় বেঁধে ভগবতী ধোবার মতো ব্রায়োনিয়া খাব।

অসীম যাবার দিন, তবু লক্ষ্মীর মনটা খারাপ হয়ে যেতে লাগলো। বললেন—গিয়েই একটা চিঠি লিখিস।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে ফিরে এলো অসীম।

—মা, তুমি ভেবনা ত' ওরকম। ভুলে যাচ্ছ কেন, বললাম যে তখন? আমরা ত' অজয়দের বাড়িতে যাচ্ছি? অজয়ের কাকা যে ওখানে বড় ডাক্তার। কোন অসুবিধা-ই হবে না।

অসীম যাবার দিন অঞ্জনা এসেছিল। অঞ্জনাকে কিছুতে ছাড়লেন না লক্ষ্মী। তার শ্বশুর বাড়ীতে ফোন করে দিয়ে বললেন,

—আজকে থাক—কাল ওকে আমি নিজে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।

সেইদিন দুপুরে বসে লক্ষ্মী অঞ্জনাকে নিয়ে তাঁর বড় আলমারী খুললেন। গহনা কাপড় সব টেনে নামালেন। বললেন,

—গুছিয়ে দিয়ে যা অঞ্জু। কত দিন হাত দিতে পারি না। অগোছালো হয়ে আছে।

অঞ্জনার কাছে বসে সেদিন লক্ষ্মী কাজ করতে করতে অনেক মনের ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

—তোকে আমার নিজের বালাজোড়া দেব। যখন পরবি বৌদিদি-র কথা মনে হবে।

এতবড় মেয়ে, দুটি ছেলের মা—কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে অঞ্জনা তেমনই আবদার করে কথা কইতো। সে বলেছিলো,

—তা হবে না—তুমি যে সব জিনিস সর্বদা পর, তোমার গায়ে থাকে তারই একটা আমাকে দিতে হবে। আমি সেটা সর্বদা পরব। আমি ঐ হারটা চাই।

ছোটবেলা, কোন আবদার জানবার সময়ে লক্ষ্মীর খুব কাছে এসে অঞ্জনা ঐ হারটা ধরে কথা বলতো, সে কথা লক্ষ্মীর মনে পড়লো। অমনি ঈষৎ করুণ হয়ে গেল মমতায় ভরা চোখ। বললেন,

—তাই দেব। তোর আর ছেলেমানুষী গেল না অঞ্জু। তবে আমার গলার হার—সে ত' আমি না মরলে পাবি না?

—না বৌদি, আমি হার চাই না। তুমি অনেকদিন বেঁচে থাক।

দুটি মানুষ—যারা দুইজনে দুইজনকে ভালবাসে—এ ছিলো তাদের মধ্যে অন্তরের কথা। কিন্তু পরে যে মনে হবে—এ মৃত্যুর-ই পূর্বাভাস—সে কথা কে ভেবেছিল?

কন্‌ফারেন্স যেদিন শেষ হবে—সেদিন যাবার সময়ে সুরেশকে লক্ষ্মী বললেন,

—খোকার জন্মদিন কিন্তু এগিয়ে এলো। আজ ফিরবার সময়ে ক্যামেরাটা কিনে এনো কেমন? ভুলে যেয়োনা কিন্তু।

—আসব। তুমি বরং বিকেলের দিকে টেলিফোনে একবারটি মনে করিয়ে দিও। ভুলে যেওনা।

—ফোন করব? আচ্ছা কিন্তু যদি নাই-ই করি—তবু…

—কেন লক্ষ্মী?

—না, ফোনটা নিচে ত! দুপুরে ত' একটু শুয়ে থাকি।

—না, না, শরীর খারাপ লাগে যদি তবে নেমে এসে ফোন করবার দরকার কি?

—আচ্ছা, আমি না করি, বিশ্বনাথ করবে। তার চেয়ে শোন ও যখন দুপুরে খাবার নিয়ে যাবে—ওর হাতে লিখে দেবো।

—খুব বললে—জানো আজকে সেন আমাদের লাঞ্চে ডেকেছে। তবে শোন—

বলে সুরেশ কাছে এলেন। বললেন,

—আমি ভুলবনা। হলো ত? আমি কিছুতেই ভুলবনা। শোন, রুমালে বেঁধে রাখলাম টাকা। তাহ'লে-ই মনেপড়বে। কেমন?

সুরেশ যখন কোনো কাজের ভার নিয়ে যান বাড়ী থেকে—যা তাঁর মনে থাকবেনা বলে তাঁর আর লক্ষ্মীর দুজনেরই বিশ্বাস—

তখন রুমালে অমনি করে টাকা বেঁধে রাখলে—প্রয়োজনে সে রুমাল বের করতে চট করে তাঁর মনে পড়ে যায় কাজের কথা।

বেরুবার সময় ব্যস্ত হয়েই বেরোলেন সুরেশ। বললেন—আজ যদি শরীরটা খারাপ লাগে, তবে নিচে নামছ কেন লক্ষ্মী?

—ও কিছু নয়। একটু জ্বর জ্বর লাগছে। নামলাম ত কি হলো? তোমাকে এগিয়ে দেবনা?

নিচে এসে গাড়িবারান্দায় দাঁড়ালেন লক্ষ্মী। পাতলা একটা শালগায়ে গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন লক্ষ্মী মিষ্টি হাসিটি ঠোঁটে মেখে—এই ছবিখানাই মনে রাখতে চান সুরেশ। কিন্তু সে ছবিটাকে ভেঙে চুরে ফেলে অন্য কতকগুলো ছবি মনে পড়ে।

শেষ হয়েছে কনফারেন্স। সবকাজ সেরে ফিরেছেন তিনি। নিচে ছোটকাকার গাড়ীটা দেখেও কিছু মনে হয়নি। ওপরে উঠতে ছোটকাকাকে ঠিক সিঁড়ির মুখেই পেলেন। তাঁকে দেখে ছোটকাকা বললেন,

—তোকে ব্যস্ত করতে চাননি বৌমা। তবে শরীরটা বৌমার বড্ড খারাপ। জ্বরটা তেমন কিছু নয়। তবে বুকের ভেতরে একটা শ্বাসরোধের ভাব—কেন হচ্ছে এমন? আমি যেন ভাল বুঝছিনা। মানে এরকম লাগবার কি কারণ থাকতে পারে? আমি সেনকে ডেকেছি। দু'জনে থাকা ভাল।

ছোটকাকার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এমন কি হতে পারে, যেজন্য ছোটকাকা নিজেকে অসহায় বোধ করছেন, আর পি. জি. থেকে ডক্টর সেনকে ডাকবার দরকার হলো—বুঝতে পারলেন না।

লক্ষ্মীকে দেখেও ত' তেমনি কিছু বোধ হলোনা। জ্বর কোথায়? একশো এক কি জ্বর? তেমন জ্বর ত' লক্ষ্মীর কতবারই হয়েছে।

লক্ষ্মী আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন। স্বামীকে দেখে হাসতে চেষ্টা করলেন। বললেন,

—গলার নিচে নিশ্বাসটা কেমন যেন শুধু আটকে আটকে যাচ্ছে। ছোটকাকা তাতেই ব্যস্ত হয়েছেন।

ব্যস্ত হবার যে কারণ ছিল, সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নয়—তা বুঝতে ত' আর দেরী হলোনা। ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন লক্ষ্মী। সেন এলেন, ভৌমিক এলেন—আরো কত ডাক্তার, কতরকম ক্লিনিকাল টেস্ট। নিচের ড্রয়িংরুমে ডাক্তাররা কয়জন কত পরামর্শ-ই না করলেন!

সুরেশ একেবারে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কিছু বুঝতে পারেননা। কথা কওয়াতে বারণ করেছেন ডাক্তার। কথা কইবার চেষ্টাতে কষ্ট হবে লক্ষ্মীর। সে সব মনে থাকেনা সুরেশের। কথা বলবেন না বলে বেরিয়ে যান ঘর থেকে আবার তখনি ঘুরে আসেন। বলেন,

—শোন লক্ষ্মী, কি কষ্ট হচ্ছে বলতো? মাথার নিচে আর একটা বালিশ দেব? শোন, গরম কিছু খাবে?

লক্ষ্মী ততই হাসেন। এই হাসিটুকু মুখে আনতে তাঁকে কত কষ্টই না করতে হয়। হেসে তিনি নিচুগলায় বলেন—কিছু হয়নি আমার। ছোটকাকা মিছিমিছি ব্যস্ত হয়েছেন।

রোগ যে ধরা গেলনা—এই হলো চরম বিপত্তি। ডাক্তারদের এতচেষ্টার পর রোগ ধরা পড়লো। রোগীর সবটুকু জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন।

ধরতে পেরে সাফল্যের সঙ্গে ভৌমিক বললেন—সিরোসিস্ হয়েছে লাংস-এ। এখনো এদেশে এ অসুখ তেমন দেখা যায়না। বুঝলেন ডক্টর সেন? তবে ক্বচিৎ কখনো—কেন, জার্মাণ জার্নালটায় পড়েননি? মনে পড়ছে না?

লাঙস্-এ সিরোসিস্? কি সর্বনাশা ভয়দেখানো কথাগুলো। লক্ষ্মীর মুখের সে হাসি তেমনই অটুট রইলো—তবে ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর কতকগুলো শক্তি যেন সেই অসমসাহসী জীবন-দীপটাকে বারবার নিভিয়ে দিতে চাইলো।

স্থরেশের হাত চেপেধরে লক্ষ্মীর সে কি সকরুণ মিনতি।

—আমাকে বাঁচাও! আমার এতকষ্ট হয়েছে কেন?

ছোটকাকার কাছেও বারবার বলে,

—আপনি আমায় বাচান। আমাকে আপনার বাঁচাতেই হবে। আমি ছাড়া এদের কেউ নেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামী কোন সেনাপতির মতোই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে লড়তে লাগলেন ছোটকাকা রোগের সঙ্গে। বুঝতে পারছেন কোন উপায় নেই। প্রতি পদে পদে বিজেতার কাছে একটু করে জমি ছেড়ে গুটিয়ে আসবার মতো রোগের কাছে একটু একটু করে লক্ষ্মীর দেহটাকে হারাতে হচ্ছে। তবু তিনি দমলেননা।

টেলিগ্রাম চলে গেল পুরীতে। চলে এলো অসীম। যে সব ছেলেমেয়েরা লক্ষ্মীর স্নেহছায়ায় বড় হয়েছে, আজ তারা যে যার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে জীবনে, তারাও এলো। বস্তির লোকজনরা উঠোনে দাঁড়িয়ে চুপকরে রোগীর অবস্থাটুকু জেনে চলে যায়। বাড়ী ভর্তি মানুষ। এতগুলি মানুষ নড়ে চড়ে কাজকর্ম করে—যেন ছায়া চলে ফিরে বেড়াচ্ছে কোন শব্দ হয় না।

অসীম বসে থাকে মা-র পাশে। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সে। মুখে কোন কথা নেই। মাসী স্থষমা, অথবা তার অঞ্জু পিসী তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। স্থরেশ কিছুই করতে পারেননা—শুধু চেয়ে থাকেন লক্ষ্মীর মুখের দিকে।

কিছুতেই কিছু হলোনা। সে সাংঘাতিক রোগ ধীরে ধীরে ফুসফুসের রক্তবহানালী, জালের মতো সূক্ষ্ম শিরা উপশিরা সব

গ্রাস করে ফেললো। লাঙ্স্-এ সিরোসিস্—তাও ধরা পড়তে দেরী হয়ে গেল—ওষুধ বা চিকিৎসাতে কোনকাজই হলোনা।

দশদিনেরদিন বাড়ী আঁধার করে চলে গেল স্বর্ণপ্রতিমা। পাড়াপ্রতিবেশী ভেঙে এলো। বাড়ীর চাকরবাকর আর বস্তির মানুষ। তাদের ত' আর সভ্যজগতের অনুশাসন মানবার দরকার নেই, তারা কাঁদতে লাগলো অকৃত্রিমশোকে।

আরো কতমানুষ, আরো কতজনের শোক। সকলের কথা সুরেশের মনে পড়েনা। মনে পড়ে অঞ্জনার কথা। আগের দিন রাতে জোর করে বাড়ী নিয়ে গেছে তার স্বামী। সকালে খবর পেয়ে সে এসে আছাড় খেয়ে পড়লো লক্ষ্মীর বুকের উপরে।

—এমন করে তোমার হার আমি চাইনি বৌদি!

অসীম হয়ে গিয়েছিলো পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ! মার গায়ে হাত রেখে সে বসেছিল পাথর হয়ে। সুরেশের চোখে জলও ছিলনা—কান্নাও ছিলনা। তিনি শুধু ডাক্তার ভৌমিকের হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

—এমন করে আপনি যেতে পারেননা ডক্টর। লক্ষ্মীকে আপনি ফিরিয়ে দিয়ে যান।

ছোটকাকা দুইহাতের উপর মাথা রেখে বসেছিলেন। তিনি কোন কথা কননি।

॥ চার ॥

বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙে দিয়ে যায় লক্ষ্মী। মাসখানেক ধরে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন সুরেশ। কান্না ছিলনা, শোকছিলনা—বসে থাকতেন দিনে আর রাতে। রাত হ'লে আলোনিভিয়ে আঁধারে বসে থাকতেন। যদি প্রিয় দেহীজনের আকর্ষণে একবার ফিরে আসেন লক্ষ্মী—তখন তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করবেন। জিজ্ঞাসা করবেন যে কুড়ি বছরের জীবনে যিনি এতটুকু ছলনা করেননি, যাঁর মধ্যে এতটুকু ফাঁকি ছিলনা, তিনি কেন এমন করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। এ ব্যবহারের কি কারণ ছিল? লক্ষ্মীর উপর তাঁর শুধু অভিমান, একটা যুক্তিহীন বুকজোড়া অভিমান।

একলা ঘরে বসে লক্ষ্মীর ছবিখানার দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর কত কথা মনে হয়েছে। মনে হয়েছে নিজের হাতেগড়া এই সাধের সংসার—একবার কি দেখে যেতেও মন চায়না লক্ষ্মার? অসীম স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত যে লক্ষ্মী ঘর আর বাইরে করতেন তাঁর কি একবার ছেলের সে মুখখানা দেখতে ইচ্ছে হয় না?

আর যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহের মন্ত্র, শুধু মন্ত্রোচ্চার নয়—এমন করে সত্যি হয়ে উঠেছিল, তাঁর কাছেই বা কেন একবার এসে দাঁড়াল না লক্ষ্মী?

দিন ও রাতের সে প্রতীক্ষা মিথ্যে হয়ে গেল। নিজের আগুনে যেন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলেন সুরেশ। আবার জোর করে বেঁচে উঠলেন। বেঁচে উঠলেন—তবে আধখানা মানুষ হয়ে। সে মনপ্রাণ, সে কর্মোদ্যম, সে জীবনীশক্তি সব-ই যেন কমে গিয়েছে।

মৃত্যু একটা বিশাল নিরুত্তর। মৃত্যুর পরে আর কিছু রইলনা। মৃত্যু নিরুত্তর-ও বটে উত্তরও বটে। সুরেশ বুঝলেন—মানুষের সকল আকুতি সকল অশ্রুজলের উত্তর ঐ মৃত্যু। সে সুগভীর কৃষ্ণ যবনিকা টেনে দিয়েছে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের ওপর।

মানুষের স্নেহ ভালবাসা কি পাননি তিনি? পেয়েছেন ত? লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর দুই বছর ধরে অঞ্জনা আসতো, সুষমা আসতেন। একজন না একজন দিন কাটিয়ে যেতেন। বৌদির সে হার অঞ্জনা কোনদিনও পরতে পারেনি। তার মনে সেই একদিনের কথা কাঁটার মতো বিঁধে ছিলো।

প্রথমে ত' সংসারটা ভেঙেচুরে গিয়েছিল কি না! কি যে কোথায় আছে, গরম জামাকাপড় কোথায় থাকে, সংসারের আর কি কোথায় আছে, সুরেশের অফিসের কাগজপত্র কোন আলমারীর কোথায় আছে—কিছুই জানতেন না সুরেশ।

অঞ্জনা এসে এসে সযত্নে শেখালো সব বিশ্বনাথকে।

—এইখানে রুপোর বাসন তোলা আছে। বছরে দুইবার বের করিয়ে পরিষ্কার করাতেন বৌদি। এইখানে গোছানো আছে পুরনো জামাকাপড়। খোকার জন্মদিনে ফলমিষ্টি কিনে এইসব জামাকাপড় গোছা ক'রে ঐ হাঁসপাতালটায় পাঠাতেন। বড়দাদার জামাকাপড় বরাবর ধুতে পাঠাতেন চৌরঙ্গীতে।

হাতের পিঠে চোখের জল মুছে মুছে অঞ্জনা বিশ্বনাথকে সব শিখিয়ে গিয়েছে। তিনি যাকে যা দিতে চেয়েছিলেন, সে-ই সব দিয়ে গিয়েছে।

তারপর তার নিজের সংসার নিয়ে সে জড়িয়ে পড়েছে। আর আসতে পারে না তেমন করে।

প্রথমদিকে ছোটকাকা রোজই চেম্বার থেকে ফেরবার সময় আসতেন একবার করে। লক্ষ্মীকে যে বাঁচাতে পারেননি—

যোগটা যে ধরতে পারেননি—সে ব্যথা তাঁর বুকে শেল হয়ে বিঁধে ছিলো। কথায় বার্তায় প্রায়ই বেরিয়ে পড়তো সে দুঃখটা। অসীমকে বলতেন,

—তোর মা শুধু দিয়েই গেল আমাকে। কত ভাবে, কত রকমে সাহায্য করলো। আমাকে কিন্তু এতটুকু দিতে দিলো না। কিছু না নিয়ে আমাকে ঋণী করে রেখে চলে গেল।

ছোটকাকাও আজ পাঁচ বছর নেই। তারপর থেকে দশবছর হয়ে গিয়েছে। সুরেশ আর ব্যবসা তেমন বাড়ান নি। একদিন তাঁর সব কাজের পেছনে ছিলেন লক্ষ্মী। তিনিই ছিলেন তাঁর প্রেরণা। তাই নিজেকে বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেকখানি করে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন সুরেশ। পরিশ্রম গায়ে মাখতেন না। কোন বাধাকেই বাধা মনে হতো না—নিজের কাজ ছাড়া আর কোন কিছু ভাবতেন না—জানতেন না—কেননা জানতেন যত বড় ঝঞ্ঝাই পাড়ি দিয়ে ফিরতে হোক তাঁকে—লক্ষ্মীর কাছে এলেই সব সন্তাপ জুড়িয়ে যাবে। স্নেহ, প্রেম, সাহচর্যে তাঁর সমস্ত দিনের ক্ষয় ক্ষতির শূন্যতাগুলো ভরে দেবেন লক্ষ্মী।

সেই লক্ষ্মী নেই। বন্দরের আশ্বাস না থাকলে জাহাজ ভাসিয়ে কি লাভ ?

সুরেশ তাই গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। যতদিন না ছেলে বড় হয়েছে, তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—তাঁর ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে—ততদিন অবধি তিনি অফিসে গিয়েছেন—সব দেখাশোনা করেছেন। তবে সে সুরেশ মৈত্রকে আর খুঁজে পায়নি মানুষ। সেই যে দুই কাঁধ টানটান, মাথা উঁচু—এই অবাঙালী ব্যবসায়ীর ডামাডোলের বাজারে বাঙালীকে সৎব্যবসায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুরেশ মৈত্র—তাঁকে আর দেখা গেল না।

দুই কাঁধ নেমে গিয়েছে, ভেতর থেকে চলনেবলনে সে দীপ্তি

গিয়েছে নিভে—বুঝতে দেরী হলোনা গোটা মানুষটা-ই গিয়েছে ভেঙে।

সুরেশের সম্পর্কে অন্যান্য ডিরেক্টারদের কত আশা ছিলো। বাংলাদেশের সমস্ত ক্ষেত্রে যখন অবাঙালী ব্যবসায়ীর পাঞ্জা সমানে অধিকার বিস্তার করে চলেছে—তখন একজন সৎ বাঙালী ব্যবসায়ী যদি উঠতে পারেন ও দাঁড়াতে পারেন—সেটার ওপর তাঁরা অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন।

তা আর হলো না। তাঁরাও বুঝলেন, এ আর ফিরে হবার নয়—বৃথা ব'লে কোন লাভ নেই।

অসীম বি. এস সি. পাশ করে কিছুদিন পড়লো সায়েন্সের জার্নালিজ্‌ম। তারপর এসে যোগ দিলো বাবার অফিসে। কাজ বুঝে নিলো—বাবার কর্মপদ্ধতি বোঝবার চেষ্টা করলো—আস্তে আস্তে সুরেশের অনেক দায়িত্ব-ই সে তুলে নিলো। বেঁচে গেলেন সুরেশ।

চিরদিনই কাজটাকে ভালোবেসেছেন। আজ তাই নিজের মতো করে নতুন নতুন কাজ খুঁজে নিলেন। বাঁচতে ত' হবে। আর বাঁচতেই যখন হবে, তখন যতটা ভালো লাগিয়ে বাঁচা যায় ততই ভাল। কাজ, এবং আরো অনেক কাজ ছাড়া বুকের ভেতরকার এ শূন্যতাবোধ আর কিছুতে যাবে না।

ছটো স্কুল গড়েছেন সুরেশ। বেহালায় লক্ষ্মীর নামে একটি স্কুলে মেয়েদের নানারকম কারিগরী হাতের কাজ শেখানো হয়। সরকারী সোস্যাল এডুকেশন স্কীমেরও সুনজর পড়েছে। এমনও আশা করবার কারণ আছে, যে এই স্কুলটাকে যদি তিনি আর বছর খানেক ভালভাবে চালাতে পারেন—তাহ'লে সোস্যাল এডুকেশন স্কীম এটাকে স্বীকারও করতে পারেন। এখান থেকে যারা বেরুবে, সেইসব মেয়েরা অন্যান্য স্কুলে হাতের কাজ ও ক্রাফ্‌ট শেখাবার চাকরী পেতে পারে।

বালিগঞ্জে ছেলেদের স্কুলটারও প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট তিনি সেই স্কুলটা নিয়ে তাঁকে অনেক লড়তে হয়েছে। এ বছর থেকে সে স্কুলটাও সরকারী সাহায্য পেয়েছে।

এই দুটো স্কুল ছাড়াও আছে তাঁর লাইব্রেরী মুভ্‌মেন্ট: পাড়ার লাইব্রেরীটা ত' গোড়াতে তাঁর টাকাতেই হয়েছে। সে লাইব্রেরীতে এখন হাজার ছয় বই। সে লাইব্রেরীর অনুষ্ঠান আছে, সভাসমিতি আছে—সুরেশের কাজ কি কম?

নিচের একটা ঘর তো অফিস কামরা। সুরেশের স্কুল কমিটির লোকরা আসেন—মিটিং হয়—অসীমের বন্ধুবান্ধব আসে —তাদের সুরেশই আপ্যায়ন করেন। দিনে রাতে সময় কোথায় সুরেশের?

তবু কত সময়। একলা থাকলেই যেন বুকের সে লুকোন ব্যথাটা জানান দিয়ে উঠে আসতে চায়। সব মিথ্যে মনে হয়। এতকাজে ভরা যে দিনরাত্রি—তাও মনে হয় সব শূন্য। একটা অদ্ভুত রিক্ততা—চূণকামকরা একটা সাদা এবং খালি ঘরের মতোই মনটাকে তাঁর ভারী করে তোলে।

এমনি সব নিঃসঙ্গ মুহূর্ত ছাড়া শোবারঘরে গিয়ে লক্ষ্মীর ছবিটা দেখেননা কখনো সুরেশ। সমস্ত মনটা জুড়ে যখন লক্ষ্মী ছাড়া আর কেউ নেই,—সেই সময় ছাড়া অন্য সময় আধখানা মন নিয়ে দেখলে যেন লক্ষ্মীর অবমাননা হবে।

সৌরভের আঁকা ছবিটিতে লক্ষ্মীর চোখমুখ কত জীবন্ত। ছবির ওপর আলো পড়লে মনে হয়—লক্ষ্মীর প্রসন্ন হাসি ঝরে পড়ছে। গলায় সোনার হার চিকমিক করছে—মাথায় ঘোমটা ঈষৎ টানা— পায়ের কাছে শাড়ার কালোপাড় কুঁচিয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

চেয়ে চেয়ে সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে সুরেশের। মনে হয় এই বুঝি লক্ষ্মী মাথার তেলের সুগন্ধে বাতাস ভরে ঘরে এলেন।

কোমল পা ফেলে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন পেছনে। চেয়ারে হাত রেখে বললেন,

—তুমি এখনো তেমনিই বসে রয়েছ? উঠবেনা? বেলা কত হলো বল ত? কত কাজ রয়েছে মনে নেই বুঝি?

এই স্বপ্নবিভ্রম এমন সত্যি হয়ে ওঠে, যে সুরেশের মনে হয় ঘাড় ফেরালেই দেখতে পাবেন সেই প্রিয় মুখ। পাছে ভ্রম ভেঙে যায়, তাই ঘাড় ফেরান না সুরেশ।

কিন্তু বড় রূঢ় এই বাস্তব। বিভ্রমের মায়াটুকুও ধরে রাখতে পারেন না সুরেশ।

একদিন, শুধু একদিন দেখেছিলেন স্বপ্নে। সে বছর পাঁচেক আগেকার কথা। অসীমের খুব জ্বর হয়েছে। অসীমেরই ঘরে ক্যাম্পখাটখানা নিয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন সুরেশ বেডল্যাম্প জ্বেলে। বই পড়তে পড়তে চোখটা জুড়ে এলো।

স্বপ্ন দেখলেন—লক্ষ্মী পর্দা সরিয়ে ঘরে এলেন। সেই সুন্দর সত্যস্নাত চেহারা। কপালের টিপ জ্বল জ্বল করছে। ছেলের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছেন লক্ষ্মী। খাটের বাজুতে একটা হাত রাখা, অন্য হাতে মাথার কাপড় টানলেন।

—লক্ষ্মী তুমি এসেছ?

এই বলে যেমন উঠতে যাবেন সুরেশ, তাঁরও কাছে এলেন লক্ষ্মী। হেসে বললেন,

—তুমি কি চিরদিনই অবুঝ থাকবে? কেন আমার জন্যে কষ্ট পাচ্ছ? তোমরা ভাল আছ, সুখে আছ তাই জানলেই আমি সুখে থাকব। আমার কোন কষ্ট থাকবে না।

তিনি যেন বললেন,

—লক্ষ্মী, তুমি এমনকরে আমাদের ভুলে কেমন করে আছ? আমাদের জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

লক্ষ্মী হেসে বললেন,

—আমার কষ্ট হলে তোমাদেরও ত' মনে দুঃখ হবে। সেই জন্যেই আমি মন খারাপ করি না।

এই বলে লক্ষ্মী পেছন ফিরলেন। একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন পর্দা তুলে।

—লক্ষ্মী, তুমি যাচ্ছ ?

এইবলে যেমনি চমক ভেঙে উঠতে যাবেন সুরেশ—ঘুমের ঘোর ভেঙে গেল। দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। কেউ কোথাও নেই।

এখন আর সুরেশ মন খারাপ করতে চান না। মনেপ্রাণে একটা বিশ্বাস আছে তাঁর। সে বিশ্বাসটার খানিকটা সংস্কার খানিকটা অন্ধ ভালবাসা—তবু বিশ্বাসটা দৃঢ়মূল। তাঁর ধারণা যেদিন তাঁর চলে যাবার সময় হবে—মৃত্যুটা তাঁর কাছে আর ভয়াবহ থাকবেনা। মৃত্যুকে সুন্দর করে নিতে লক্ষ্মী থাকবেন সে সন্ধিক্ষণে অপেক্ষা করে। কেমন বেশে থাকবেন, তাও তাঁর মনে আঁকা। রোগে পাণ্ডুর, নিমীল নয়ন, সে লক্ষ্মী নন্। তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন সেই ষোল বছরের কিশোরী লক্ষ্মী—ঢাকা থেকে যে মেয়েকে তিনি বিয়ে করে এনেছিলেন—তেমনিই সিঁদুরে লাল চেলী শাড়ী আর সিঁথিমৌর পরা বধূবেশে। লক্ষ্মীর হাত ধরে সে অনন্তের বাসরঘরে প্রবেশ করতে এতটুকু ভয় পাবেন না তিনি। যিনি তাঁর জীবনকে সুন্দর করেছিলেন—মৃত্যুকেও তিনিই মধুর করবেন।

তবু ঘরদোরের নিঃসঙ্গতা কি সবসময় ভাললাগে ? অঞ্জনা মাঝে মাঝে আসে আজও। সে-ই গৃহিণী এখন, তেমন আসতে পারে না। তবে যেদিন আসে, সেদিন সকালে এসে সারাদিন কাটিয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের কোনদিন বা আনে—কোনদিন বা

স্কুলে পাঠিয়ে আসে। এলে পরে নিজে রান্নাবান্না করে—জোর করে খাওয়ায় সুরেশকে। বলে,

—জামাকাপড় কোথায় তোমার বড়দা? বিশ্বনাথ বের করে দিতে পারে না? ময়লা জামা পর কেন?

কোমরে ঝাড়ন গুঁজে ঘুরে ঘুরে সুরেশের ঘর পরিস্কার করে সে। ধুলো ঝাড়ে সব জায়গা থেকে। কোনদিন বা ঝি-কে নিয়ে ঠাকুর ঘর পরিস্কার করতে যায়। বলে—ঠাকুর ঘরে ঝুলকালি কোনদিনও বরদাস্ত করতে পারতেন না বৌদিদি। বিশ্বনাথ এগুলো দেখনা কেন?

বিশ্বনাথ লজ্জা পায়। হাতে হাতে সেও সহযোগিতা করে। মাপ চাইবার ভঙ্গীতে অপ্রতিভ হয়ে বলে,

—রোজই ত' আমি একবার করে—চেষ্টাও করি। তবে কি জান? আমাদের দৃষ্টি কি তোমার মত চলে পিসীমা? তোমার চোখে যেমন ধরা পড়ে—কি জান, বাড়ীতে আমাদের বৌ মেয়ে দরকার। তাছাড়া এতদিন চলেছে, আর চলেনা।

অঞ্জনা-ও সেটা মর্মে মর্মে বোঝে। সুরেশের খাওয়ার সময়ে সামনে বসে এটা সেটা তুলে দেয় পাতে। সুরেশ বলেন।

—কেন একদিনের জন্যে অভ্যাস খারাপ করিয়ে দিচ্ছিস্ অঞ্জু? তুই ত আর বরাবর থাকবিনা?

আগে সুরেশকে কত ভয়-ই পেয়েছে অঞ্জনা। আগে এমন করে সামনে বসে কথা কইবার কথা সে ভাবতে-ই পারতোনা। এখন আর সেদিন নেই। অঞ্জনার বয়স-ও বত্রিশ হয়েছে। আর সে-ও এখন ছোট্ট একটি সংসারের গৃহিণী। সে বলে—

—বড়দাদা, বরাবরের জন্যে সেবাযত্নের ব্যবস্থা ত তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পার। বৌদির হাতে গড়া সংসার, এমন খাঁ খাঁ করে, এ কি চোখে চেয়ে দেখা যায়? তুমি অসীমের বিয়ে দাও।

—তুই একটি মেয়ে দেখে দে।

—যেমন তেমন হলে ত' হবে না বড়দা—তাঁর যোগ্য বৌ ত' হওয়া চাই।

—তেমনটি আর কোথায় পাবি ?

মুখ ফস্কে মনের কথাটা বেরিয়ে যায় সুরেশের। অঞ্জনা বোঝে। চুপ করে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে বলে

—তাই মনে করে-ই ত' কোন মেয়ে চোখে ধরে না। মেয়ে ত কত-ই দেখি !

—তবু দেখিস্। আর খোকার সঙ্গে তোর ত' কথা হয়—ওর যদি কোন পছন্দ থাকে—

—তোমার ছেলে সেদিকে অকর্মা, বড়দাদা। আমার বড় জা ওকে নেমন্তন্ন করে তাঁর সেই বোনটি—খুব ফর্সা ত ! বেশ স্মার্ট—ভালোমেয়ে—কত আলাপ করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন দিদি। কিছুতেই ছেলে আলাপ করলোনা। দুটো একটা কথা কইলো, ওঁরা যা বললেন তার জবাব দিল—তারপর উঠে এসে আমার সঙ্গে গল্প করতে সুরু করলো। না না—ও তোমাকেই দেখে শুনে দিতে হবে।

শুধু কি অঞ্জনা ? অসীমের ছোট মাসী সুষমা-ও এখন আসতে যেতে বলেন সুরেশকে। সুষমা-র স্বভাব তাঁর দিদি লক্ষ্মীর বিপরীত। লক্ষ্মী যেমন ধীর স্থির ছিলেন---সুষমা তেমন নন। তাঁর কথা বলবার ধরণ-ই হলো, এই বিষয় নিয়ে যেন বহুক্ষণ তর্ক চলেছিলো, এখন সুষমার কথার সঙ্গে সঙ্গে-ই তর্কটা থামিয়ে দেওয়া হবে। সুষমা-কে বরেনবাবু কতবার বলেছেন

—তুমি অতজোর দিয়ে কথা বলে মিছে-ই শক্তিক্ষয় করছো সুষমা। তুমি যদি খুব আস্তে করে-ও বলে দেখ—তাহলে-ও দেখবে তোমার কথা বিনাবাক্যে মেনে নিচ্ছি আমরা। সত্যি,

তোমাকে দেখে আর বুঝতে ভুল থাকে না যে তুমি পুলিশ অফিসারের বৌ। সাধে কি আমার অফিসের নতুন পিওনগুলো বাবু বলতে তোমাকেই বোঝে?

সুষমা সাময়িক ভাবে লজ্জা পেয়ে যান। কিন্তু তার পরে তাঁর যখনই মনে হয় যে না, অসীমের বিয়ে না দিয়ে সুরেশ খুব স্বার্থপরের কাজ করছেন, তখনই মনে মনে জমতে থাকে প্রতিবাদের সুর। তিনি এ বাড়ীতে এসে সুরেশকে সরাসরি আক্রমণ করেন। আর বাক্যযুদ্ধে তিনি মহাভারতের নীতিতে বিশ্বাসী। প্রথমেই প্রতিপক্ষকে শতঘ্নী ও ব্রহ্মশিরা জাতীয় অস্ত্রক্ষেপণ করে একেবারে কাবু করে ফেলতে চান সুষমা। কোনরকম ভূমিকা বা ভণিতা না করে-ই বলে বসেন

—এমন সাজানো লক্ষ্মীর সংসার। দিদি-র কপালে ছিলনা, তাই সাজিয়ে গুছিয়ে-ই রেখে গেল। ভোগ আর করতে পেলনা। তা ব'লে আপনি কেন এমন করে চোখবুজে থাকবেন বলুন? ছেলেটার-ও মুখের দিকে চাইবেন তো! ওর মা নেই—সে কথা কি আপনার ভোলা উচিত? আপনাকে-ই যে এখন মা হয়ে ছেলের মন বুঝতে হবে—বাপ হয়ে কর্তব্য করতে হবে।

—তা ত' বটে-ই—তা ত' বলতেই পারো সুষমা—

ব'লে দিশাহারা হয়ে চুপ করে থেকেছেন সুরেশ। সুষমা আবার বলেছেন

—কি করছেন বলুন, ছেলের বিয়ের?

—তোমরাই তো দেখে দেবে। অঞ্জুকে-ও বলেছি—

—অঞ্জনা বড় খুঁৎ খুঁতে। অত বেছে কি বৌ আনা যায়?

সুরেশ অঞ্জনার মন বোঝেন। তাই বলেছেন

—কি জানো, অঞ্জু বড় ভালবাসতো তোমার দিদিকে। ও বলে, তাঁর সংসারে তাঁর মতো যোগ্য একটি বৌ না হ'লে কি মানায়?

—সে ত' নিশ্চয়—

বলে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন সুষমা। তারপর বলেছেন

—দিদির মতো মেয়ে কি আর চাইলেই মেলে জামাইবাবু! ভাল একটি মেয়ে যদি হয়—চেনাজানাঘরের—বংশ ভাল—শিক্ষা-দীক্ষা ভাল—তবে তাকে মনের মতো করে গড়ে পিটে নিতে-ও পারবেন। তাই নয় কি?

—তা ত' নিশ্চয়।

এরপর আর কোন কথা খুঁজে পাননি সুরেশ।

অসীমের উদ্যোগী ছোটমাসিমা এখানেই থেমে থাকেননি। সুরেশের কাছে যখন কথা তুলেছেন, তখন একটি মেয়ের কথা তাঁর মনের তলায় ছিল।

তাঁর-ই ননদের মেয়ে গোপা। গোপাকে বছর বারো বয়স থেকে তার মা তৈরী করেছেন, সে কোন অর্থবানঘরের বৌ হবে শুধু এই কথা মনে রেখে। অর্থের অভাব সুনলিনীর নেই। তিনি নিজে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে এবং অবস্থাপন্ন ঘরের বৌ। তবু অর্থকেই পরমার্থ বলে জেনেছেন তিনি চিরদিন। ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনযাত্রার মান তাঁর কাছে একটা মস্তবড় জিনিষ। বরাবর বাংলার বাইরে কাটিয়েছেন। সেখানে জীবনযাত্রায় নতুনত্ব কিছু নেই! স্বচ্ছল পরিবারগুলিতে জীবনযাত্রার মান নিয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা চলে। পরিশ্রম তিনি-ও করেছেন—তবে সংসারে সত্যিকারের শ্রমের যা কাজ—সবই করেছে চাকর-দাসী। তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের মতো সংসারের পোষাকী কাজগুলি করে সংসারটিকে সুন্দর রেখেছেন।

গোপাকে জীবনে-ও কোনো কাজ করতে দেননি—পাছে তার হাতের ডৌল নষ্ট হয়ে যায়—রান্নাবান্না শখ করে-ও করতে দেননি

—পাছে মুখে আগুনের আভা লেগে রং জ্বলে যায়। গোপা শুধু উল বুনেছে, সেলাই শিখেছে, চা-খাবার পরিবেশন করেছে অতিথিদের কাছে—হারমোনিয়ম বাজিয়ে চলনসই রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে। তার ওপরে সে মায়ের কথায় পুতুলের মতো উঠেছে বসেছে—এবং তাতে ক'রে বাইরে ও পরিবারের সর্বত্র তার সুনাম একেবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এমন মেয়ে দেখা যায় না। মেয়ে হতে হয় তো গোপার মতন।

কুড়ি বছর বয়স হলো, এখনো কেমন মায়েব কথা শুনে জল উঁচু জল নিচু ব'লে চলে। কথায় বার্তায় কেমন আদুরে আদুরে খুকীভাব।

সুষমা নিজে-ও কর্তৃত্ব পরায়ণ—আর তাঁর মেয়ে ললিতা-ও তাঁর-ই মতো জেদী আর খানিকটা অবাধ্য।

কর্তৃত্ব করতে এত ভালবাসেন বলে-ই সুষমার গোপাকে ভারী পছন্দ। তিনি প্রায়ই বলেন

—না, মেয়েটি যা হয়েছে—চমৎকার। নলিনীদিদির আর কোন ভাবনা নেই।

ললিতা রেগে মনে মনে গোপাকে বলেছে ভিজে বেড়াল। কখনো বলেছে—ন্যাকা।

অবশ্য স্বগতোক্তি সেগুলি।

তারপর সুষমা আর সুনলিনীর যুগপৎ মনে হলো গোপার সঙ্গে অসীমের বিয়ে হলে বেশ হয়—তখন সুনলিনী সুষমার হাত ধরলেন। বললেন

—ভাই বৌদি, আলাপ-পরিচয়ের একটু ব্যবস্থা তোমাকেই করে দিতে হবে। জানো ত' তোমার নন্দাইকে? বলে বসবেন ও সব মেয়েলীকারবারের আমি ধার ধারিনা। অথচ আজকাল একটু আলাপ না হলে······ ··

ঐ পর্যন্ত-ই ভাবতে পারেন সুনলিনী। নিজেকে তিনি প্রগতিশীলা বলে জানেন। তাই বিয়ের প্রস্তাব মনে রেখে ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে দুজনের আলাপ করিয়ে দেওয়াটাকে তাঁর কাছে খুব আধুনিক মায়ের কাজ বলে বোধ হয়েছে। আলাপ পরিচয় হবে—তবে সবটাই তাঁদের উপস্থিতির ধার কাছ দিয়ে। অর্থাৎ তাঁরা থাকবেন কাছাকাছি। এরা দু'জন বসে আলাপ করুক না—কতই ঘনিষ্ঠ হবে? বড়জোর হাতটা ধরবে। ধরুক—তাতেই বা দোষ কি? বিয়ে ত' করবেই!

এমনি করে পরিচয় হতে না হতে, ছেলের কাছ থেকে কথা আদায় ক'রে ছেলের বাপের কাছে প্রস্তাব পেশ করে রাজী করাতে হবে। ছেলে আর বাপ, দু'জনকেই ত' বেশ সৎ আর ধর্মভীরু মনে হয়। বিয়ের কথা বললে পরে তাঁরা অস্বীকার করবেন না।

এ বিয়ে ত' প্রস্তাব করে-ও হতে পারতো?

সুষমার এ যুক্তির জবাবে সুনলিনীর-ও যুক্তি আছে। তবে সে সব কথা ত' বলা যাবেনা, যে প্রস্তাব করা হলো আর বিয়ে হলে অথচ সাবেকী চাল কোথাও ক্ষুণ্ণ হলো না। প্রায় বিশবছর স্বামীর চাকরীর জন্যে বাংলার বাইরে থেকেছেন সুষমা। এসে দেখছেন, তাঁর হাইহিল জুতো, আর সোনার ভোজালী ব্রোচ আঁটা আঁচলের আধুনিকতা অনেক দিন বরবাদ হয়ে গিয়াছে বাংলাদেশে এখন আবার ফরাসডাঙা বা ধনেখালির বাংলা তাঁতের শাড়ী, আর চুলবাঁধার ঢিলেঢালা ভাবটা চলেছে ভালো। তার সঙ্গে পাঞ্জাবী, মারাঠি, ও গুজরাটি কেশ বেশ ভূষণের জোড়াতালি মেলানো মেশানো।

সুনলিনীর ধারণা হয়েছে, যে তিনি অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। নাগাল ধরতে পারছেননা শহর কলকাতার।

তাই বিয়ের ব্যাপারে সাতকেলে একটা পুরনো ঢঙ মেনে চলে কি একেবারে বরবাদ হয়ে যাবেন ?

এই যুক্তির নিচে-ও আর একটা যুক্তি পোষাবেজির মতো মাথা গুঁজে আছে। সেটা সুনলিনীর একান্ত নিজস্ব।

সে যুক্তিটা হলো—সুনলিনীর ধারণা—সুষমা যতই সুরেশের উদারনীতির প্রশংসা করুন না কেন—বিয়ের সময় ঐ সুষমা-ই বরের মাসী হয়ে বরপক্ষের লোক সেজে দেনাপাওনার লম্বা লিস্ট বের করবেন। আলাপ পরিচয় করে বিয়ে হ'লে পরে সে সব প্রশ্ন আর উঠবে না। অন্ততঃ একথা ঠিক, যে নগদ টাকা আর দান সামগ্রীতে অনেক বাঁচাতে পারবেন সুনলিনী।

এ কথা এখনো মনের তলাতে-ই রেখেছেন। এবং এ কথা গোপন রাখতে তাঁকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করতে হ'চ্ছে। যে কোন কথা-ই গোপনে রাখা যে সুনলিনীর পক্ষে কত কষ্টকর, তা সুনলিনী-ই জানেন। কোনো কোনো সময়, স্বামী, বা মেয়ে, বা ছেলে যখন তাঁর সঙ্গে কোন বিষয়ে অসহযোগিতা করে—তাঁর—মনে হয়—এরা ও জানেনা, যে তিনি এদেরই সুবিধার্থে কত টনীতিক চাল চালছেন! মনে হয়, কোনমতে বিয়েটা হয়ে গেলে তবে এ কথা বলে তারিফ নেওয়া যাবে স্বামীর কাছ থেকে। তার আগে নয়।

এখন কিছু-ই বলতে পারেন না। ফলে একথা চাপতে গিয়ে শরীরে রীতিমতো কষ্ট হয়। ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যায়—মাথা ঝিম ঝিম করে। মাথায় ঠাণ্ডাতেল মেখে অসময়ে স্নান করে আসেন সুনলিনী।

সুষমা-ই নেন প্রাথমিক প্রস্তাবনার ভার। কোনো মেয়ে, তা সে যে মেয়ে-ই হোক না কেন, তার ওপর কারু বিয়ে

ঘটাবার ভার দিয়ে দিলে সে যত আনন্দিত হবে, এমন আর কিছুতে নয়।

নিজেদের বিয়েতে নিজেদের কিছু করবার থাকে না বলেই হয়তো পরের বিয়ে শুনলে মেয়েদের এত আনন্দ হয়।

এবং সুষমা-ও ব্যতিক্রম নন।

সুষমা কোনদিন-ও লক্ষ্মীর মতো ঘর সংসার ও পরিবারের বৃত্তের মধ্যে তৃপ্ত থাকবার লোক নন। তিনি যে বৃহত্তর কোনো কাজের জন্য সৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং ভগবান ও বরেনবাবু এই দুজন-ই তাঁকে খর্ব করে রেখেছেন এ জাতীয় অভিযোগ সর্বদাই তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে।

উচ্চপদস্থ একজন অফিসারের স্ত্রী হিসেবে অবশ্যম্ভাবী ভাবে কতকগুলো সমাজ সেবার কাজ তাঁকে করতে হয়েছে, এই যা রক্ষা। সেটুকু করবার সুবিধে না থাকলে তাঁরে অদম্য এনার্জি একান্ত ভাবে পরিবারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হতো এ কথা ভাবলে-ও বরেনবাবুর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বিয়ের আগে সুষমা রাজনীতি করবার চেষ্টা করেছিলেন। বাড়ীর লোকজন সেটা সস্নেহ প্রশ্রয়ে দেখতেন। কেননা তাঁরা ঠিক-ই জানতেন কলেজে দুই বছর পড়িয়ে আই. এ. পাশ করিয়ে-ই সুষমাকে বিয়ে দেবেন তাঁরা।

তখন সুষমা খদ্দরের দামীশাড়ী পরে মিটিংয়ে যেতেন এবং যুবককর্মীদের উৎসাহ ও স্তবস্তুতিতে নিজেকে খুব বিশিষ্ট মনে করে দাঁড়িয়ে সভার 'কার্য পরিচালনা' করতেন। সেসব নির্দোষ মিটিংয়ে রাজা বা প্রজা কারুই কোন ভয় ছিল না। পাড়ার প্রৌঢ়, অবিবাহিত—পাড়াতুতো দাদারা ছিলেন বক্তা। মেয়েদের যে অনেক কিছু করতে হবে আর ঘরের কোণে বসে থাকলে চলবেনা এই গোছের ভাবগর্ভ এবং স্বপ্নদর্শী কথা-ই ছিলো তাঁদের বক্তৃতার সারাংশ।

সুষমা দাঁড়িয়ে বলতেন।

—এবার আপনাদের কাছে, আমাদের বীরেনদা কিছু বলবেন।

বীরেনদা-রা তৈরী হয়ে-ই থাকতেন। সুরু হতো বক্তৃতা। এবং বক্তৃতার শেষে প্রচুর জলযোগের আয়োজন থাকতো। ঐ টুকু বলে-ই যথেষ্ট শিহরণ বোধ করতেন সুষমা। বাড়ীতে ফিরে এসে তার মনে হতো—বেথুন কলেজে ক্লাস করা, লজিকের নোট মুখস্থ করা—এই সবের অনেক উপরে তিনি।

বিয়ে যখন হয়ে গেল সে সব ভুলে চমৎকার মানিয়ে গেলেন তিনি নতুন পরিবেশে।

কিন্তু ছেলে মেয়ে খানিকটা বড় হতে না হতেই আবার সেইসব নানারকম কাজের প্রেরণা জাগলো। কি ভাগ্য, যে কি পরাধীন কি স্বাধীন, দুইভারতে-ই সরকারী অফিসারদের স্ত্রী-দের সমাজ সেবার কাজে বিশেষ প্রয়োজন। সমাজের বহু অবহেলিত দিক আছে, যা এইসব হাজার দেড়হাজারী মনসবদারদের পত্নীদের কর স্পর্শের অপেক্ষাতে-ই বসে আছে।

গভর্ণরের রিলিফ ফাণ্ডের জন্য চ্যারিটি করা—গরীব ছেলে-মেয়েদের জন্য Fete বা মেলা করা, হাঁসপাতালের টাকা তোলবার জন্য জলসা বসানো—এই সব অত্যাবশ্যকীয় ও অতিপ্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সুষমা।

তার মধ্যে অসীম ও গোপার আলাপ পরিচয় করাবার জন্য ভার পেয়ে তিনি আরো একটা নতুন কাজ পেলেন। নতুন শুধু নয়, একান্ত প্রিয় কাজ।

সুরেশকে বলে, বা বরেনবাবুর কাছে খেদ প্রকাশ করে-ই ক্ষান্ত থাকলেন না তিনি।

অসীমকে নেমন্তন্ন করে বসলেন এক রবিবার। বললেন

—কতদিন আমার রান্না খাসনি। আমাদের-ও ত ইচ্ছে করে।

ছোটমাসীমার এই সব ইচ্ছে মানে-ই বিয়ের প্রস্তাব তোলা, তা জানে অসীম।

তাই খেতে বসে যখনই সুষমা বলেছেন—তোকে এবার বিয়ে করতেই হবে অসীম। কোনকথা শুনবো না।

সে হেসে ফেলেছে। বলেছে।

—ও ঘরে কি পিঁড়ি সাজিয়ে রেখেছ? তুলে নিয়ে বসিয়ে দেবে?

—কেন, তুই আমাদের কত আদরের ছেলে। দিদির চিহ্ন বলতে ত' একটি-ই। তুলে নিয়ে বসিয়ে দেব কেন? অনেক দেখে শুনে বৌ আনব। বুঝলি অসীম?

অসীম বলেছে

—বুঝেছি। এ কথা দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার ননদের সেই ডলপুতুলটির কথা বলছ তো? মাপ করো ছোটমাসী। সাজিয়ে গুজিয়ে আলমারীতে রাখলেই ওকে মানায় ভাল। অসীমের ছোটমাসী অসন্তুষ্ট হতে চেয়ে-ও অসীমের কথা বলবার ভঙ্গীতে হেসে ফেলেছেন। বলেছেন

—শুধু ঠাট্টা করিস। কেন, গোপার প্রশংসা ত সবাই করে। এবার আমি সরাসরি জামাইবাবুকে বলব। শুধু তোকে বললে ঐ হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত-ই থাকবে।

মাসীমা-র চেয়ে মেসোমশায়ের সঙ্গে অসীমের জমে ভাল। বরেন ভাল বিলিয়ার্ড খেলতেন এক সময়। অসীমের সঙ্গে আবার নতুন করে তাঁর বিলিয়ার্ডে হাত ঝালাই হচ্ছে আজকাল।

স্ত্রীর অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের কাছে সানন্দে হার মেনে বসে আছেন মানুষটি। পুলিসের যে জবরদস্ত অফিসার Anti corruption-এর বড় বড় কেস ধরে বছর বছর ছাব্বিশে

জানুয়ারী গভর্ণরের কাছ থেকে খেতাব নিয়ে আসছেন—বাড়ীতে তাঁর কোন পরিচয়-ই নেই। সুষমার কাছে তিনি সর্বদা সকল বিষয়ে বিনাসর্তে আত্মসমর্পন করে বসে আছেন।

অফিসে যাবার সময়ে হয়তো জামা পরছেন—ছোটমাসী বললেন

—মাথাটা মুছলে না পর্যন্ত ?

অমনিই কথা না বাড়িয়ে শুকনো মাথাটা আবার ঘসে এলেন তোয়ালে দিয়ে।

অসীম আড়ালে নয়, সামনেই হাসে। হাসতে হাসতে বলে—ছোটমাসী, মেসোর কাজের জন্যে ত' বছর বছর খেতাব মেলে। তুমি আবার ওঁকে তাঁবে রাখো। আমি এবার মিটিং করে তোমাকে-ও এক খেতাব দেব।

এমনি ধারা হাসিঠাট্টার পটভূমিকাতে-ই একদিন গোপার সঙ্গে পরিচয় হয় অসীমের।

সুষমা আর সুনলিনী, দুই ননদভাজের যুক্ত চেষ্টায় নন্দিতার জন্ম দিনে হলো প্রথম আলাপ। গোপাকে দেখে অসীমের কি মনে হলো না হলো বোঝা গেল না। কেননা অসীম দায়সারা গোছের একটা নমস্কার করে ললিতাকে টেনে নিয়ে চলে গেলো টেবিল টেনিস খেলতে। খেলতে খেলতে কিছুক্ষণ বাদে সে বললো

—তোর ঐ গোপাদিদি কি গয়নার বিজ্ঞাপনে ছবি দেবেন ?

—কেন ?

—ও রকম গয়না পরেছেন, তাই বলছি।

ললিতার তাই শুনে খুব হাসি পেলো—আর পরে সুষমা অতিথি অভ্যাগতরা চলে যাবার পর তাকে বকতে লাগলেন

—তোমার আজ-ও কোন সহবত শিক্ষা হয়নি। বাড়ী ভর্তি অতিথি অভ্যাগত—তুমি তার মধ্যে চলে গেলে টেবিল টেনিস খেলতে। কোন জ্ঞান নেই। ভাগ্যে গোপা ছিল!

তখন ললিতা বেপরোয়া ভাবে বলে বসলো—গোপাদিদিকে নিয়ে অসীমদা হাসছিলো বলছিলো অত গহনা পরেছে কেন রে?

সুষমা বললেন—তোমাকে আর পাকামি করে রিপোর্ট করতে হবে না।

তারপর থেকে ঘনঘন নিমন্ত্রণের ধুম পড়ে গেল। সুনলিনী আর প্রকাশবাবু নিজে এসে সুরেশকে নিমন্ত্রণ করলেন। সুষমার বাড়ীতে অসীমের ডাক পড়লো বারবার। তারপর সুরু হলো জন্মদিনের পালা। সুনলিনী ও সুষমার যতজন ছেলেমেয়ে আছে, প্রত্যেকের-ই জন্মদিন হতে লাগলো পালা করে।

প্রকাশবাবু পরোক্ষে যে প্রস্তাব করলেন না সুরেশের কাছে—তা নয়। সুরেশের স্বভাবে এমন কোন মর্য্যাদাবোধ আছে, যে সেখানে বেশী কথা বলা চলে না। সুরেশ বললেন

—দেখুন প্রকাশবাবু, বিয়ের কন্যানির্বাচনের ব্যাপারে আমি অসীমকে জোর করতে পারব না। সে নিজে যদি মনস্থির করতে পারে—তখন আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসব। সাজিয়ে গুছিয়ে বিয়ে দেব। কিন্তু প্রথমে হচ্ছে মনস্থির করবার ব্যাপার। ছেলেকে আমি জোর করতে পারব না। এই কারণে জোর করব না, যে আমার দিক থেকে কোন কথা পেলে—সেটা ওর পক্ষে এমন একটা কিছু হবে, যে ও আর ভাবতে চাইবে না। যদি দুজনে দুজনকে না চিনতো, তবে আমি করতাম নির্বাচন। এক্ষেত্রে ওরা পরস্পরের পরিচিত তাই সবটাই আমি অসীমের বিচার বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিয়েছি।

অসীম হাসিখুশী স্বভাবের ছেলে। আমোদ-আহ্লাদ ভাল

বাসে। তাই সুষমা ও সুনলিনী উদ্যোগী হয়ে তাদের প্রেমের ক্ষেত্র সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন।

বোটানিকালে দিন কাটাতে গিয়ে, ওদের এক পাশে রেখে নিজেরা গেলেন হটহাউস দেখতে।

অসীম গোপাকে বললো

—একটা গান কর ত? দিব্যি বাতাস দিচ্ছে, ভালই লাগবে শুনতে।

—গান করব?

—দোষ কি? বোঝা যাচ্ছে যখন, যে ওঁরা এই চান—আমরা কিছুক্ষণ একলা বসে থাকি। তা চুপচাপ মুখ না দেখে গান শোনা বরঞ্চ ভাল। তাই না?

—কি মুশকিলে-ই যে ফেললেন অসীমবাবু? গীতবিতান নেই, হারমোনিয়াম নেই, অমনি বললেই আমি গাইতে পারি?

—তাতে কি হয়েছে? শুধু গলায় গাওয়া যায় না? অঞ্জু পিসী যে গান গায়? সে ত' শুধু গলায়।

—তিনি ত' আর গান শেখেন নি।

—তা হবে!

বলে অসীম অবাক হয়ে গিয়েছে।

দেখতে যে খুব ভালো তা নয়। তবে গোপার চেহারার মধ্যে একটা আদুরে আদুরে ভাব আছে। মায়ের দিক থেকে মেয়ের রূপচর্চায় পরিশ্রমের অন্ত নেই। লেবুর রস, চন্দন বাটা, গরম জলের ভাপ, সরময়দা, কমলালেবুর খোসা বাটা এই সব দিনরাত মেখেমেখে গোপার রংটিতে বেশ চটক লেগেছে। 'ট,—'ঠ'—এইগুলোকে বেশ নরম করে উচ্চারণ করে গোপা। কথায় কথায় অভিমান-ও হয়। আবার ফুল, চকোলেট বা সিনেমার প্রতিশ্রুতি পেলে হাসতে-ও পারে অনর্গল।

পরিচয়-ই হয়েছে যাদের, বিয়ের কথা পটভূমিতে রেখে— তাদের আলাপ এমনকরে অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না। একটা না একটা পরিণতিতে তাদের পৌঁছুতে হবে-ই।

তাই বছরখানেক বাদে সুষমা আবার সুরেশবাবুর কাছে সেই সব কথা তুললেন। বললেন

—জামাইবাবু, অসীম তো গোপার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করলো—এখন একটা ঠিকঠাক করা উচিত। এমন ক'রে ত' চলতে পারে না?

—অসীম কি কিছু বলেছে তোমাকে?

—এর আর কি বলবে? ওর যদি গোপা-কে ভালো না-ই লাগবে, তবে কি আর এমন করে এতখানি সহজে মেলামেশা করতো সে?

—বেশ তো—আমি জিজ্ঞাসা করব অসীমকে।

ছেলের সঙ্গে এমনিতে বাপের খুব সহজ সম্পর্ক—সরল বন্ধুত্ব। তবু এসব কথা বলবার জন্যে উপযুক্ত একটা সময় খুঁজেছেন সুরেশ।

বালিগঞ্জে তাঁর ছেলেদের স্কুলের জন্যে কতকগুলো খেলার সরঞ্জাম কিনে এনেছে অসীম: ব্যাগাটেলের একটা কম্পিটিশান বোর্ড—ভারী চমৎকার। দেখে-ই সুরেশ বললেন

—এ বোর্ড-টা ভারী চমৎকার তো! এটা থাকুক খোকা— এটা আর দিয়ে কাজ নেই। দিয়ে লাভ-ই বা কি! ছেলেরা কিছু আর স্কুলে বসে ব্যাগাটেলি খেলবে না। খেলবে ঐ মাস্টারগুলো।

অসীম ছেলে ভোলাবার মতো বলেছে

—এ বোর্ড-টা তাদের কথা মনে করে কিনেছি, তাদের দিয়ে দাও। আমি বরঞ্চ নিয়ে আসব আর একটা।

দিয়ে দিতে হবে বলে, এ কদিন সকালবেলা বাবা আর ছেলে বাজি ফেলে খেলতে বসেছেন। খেলতে বসলে—বিশেষ করে ব্যাগাটেল বা ক্যারম-এ সুরেশ সর্বদা কিছু সৎভাবে খেলেন না। একটু পরে-ই বাবার ডান হাতটা সঠিকভাবে দেখে অসীম খেলার নিয়মের কাগজটা বের ক'রে বসলো। সুরেশ একটু কোণঠাসা বোধ করলেই চেঁচিয়ে বাজিমাত করতে চান। তিনি-ও চেঁচাতে সুরু করলেন। অসীম বললো

—টি. এ. ছুঁয়ে গিয়েছে শুধু—আর তুমি অমনই সবগুলি বল তুলে নিলে?

—বাঃ, নইলে আর বলছে কেন বলো, যে টি. এ. মানেই হলো try again?

—আর হাত দিয়ে বোর্ড টেনে তুমি একশোর ঘরে বল গড়িয়ে দিচ্ছ কেন?

—না না খোকা। এ তুমি বলতে পারো না। বোর্ড আমার সুবিধেমতো রাখবনা?

—কখখনো নয়।

—বেশ, তবে প্রথম থেকে হোক।

—তা হবে না। আসলে তুমি-ই নিয়ম মানছনা। যেই দেখছ আমার স্কোর বেশী হলো—অমনিই তোমার খারাপ লাগছে। এ হতে পারে না।

খেলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ তুলে সুরেশ বলেন

—তুমি কি গোপাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ?

—কে বললো?

—সকলেই বলেছে। তোমরা না কি মেলামেশা করছো একবছর ধরে? বুঝতেই পারো, এর থেকে মানুষ কি ধারণা করতে পারে?

—বুঝেছি।

অসীমের ঠোঁটে কৌতুকের একটা সূক্ষ্ম রেখা খেলে যায় সে বলে

—তোমার কেমন লাগে গোপাকে, বাবা?

সুরেশ এ কথার জবাব অমন চট করে দিতে পারেন না বলতে পারেন না—এ মেয়ে আমার চোখে নেই। কেননা এ মেয়ে সে মেয়ে নয়। তোর মায়ের হাতে রচা সংসার নিজের হাতে তুলে নেবে। দরকার হ'লে আমার ইস্কুলের কাজে-ও শুভার্থীর মতো উপদেশ দেবে। আমার-ও সঙ্গী হবে বন্ধু হবে। এ মেয়ে নেহাৎ-ই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবার—আদর করবার—হাল্কা হাসিখুশী দিয়ে ভরে রাখবার মতো মেয়ে। কিন্তু সে কথা বলে কি লাভ? হয়তো তোর কষ্ট হবে।

সুরেশ বলেন

—মন্দ কি! বেশ মেয়ে! তবে তোর দিক থেকে-ই ভেবে দেখা উচিত।

অসীম চুপ ক'রে থাকে। সে গোপার সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছে সে তা নিজে জানে। জানে যে, ওদিক থেকে প্রশ্রয় যদি বা ছিল, তার দিক থেকে সে এতটুকু প্রশ্রয় নেবার চেষ্টা করেনি।

অসীম চুপ করে রইলো দেখে সুরেশ ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলেন। বলেন, যে যদি বিয়ে করতে-ই হয় গোপা সেদিক থেকে হয়তো খারাপ নয়। আর, এতদিন, এত রকম কারণে অসীম গোপাদের বাড়ী গিয়েছে এসেছে—যে এ রকম যে কোন মেয়ের পিতা-ই আশা করতে পারেন—তারপর অসীম তাঁর মেয়েকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক হবে না। বলেন

—তুমি বেশ ভালভাবে ভেবে দেখ। ভেবে, যদি মনে করো

যে না, তুমি এখনো বিয়ে করবার প্রস্তুতি খুঁজে পাচ্ছ না মনে—তবে আমার মনে হয় সে কথা-ও বরঞ্চ এই সময় বোঝাপড়া হয়ে হয়ে যাওয়া ভালো। আর যদি মনে কর যে না, বিয়ে করতে কোন আপত্তি নেই তোমার, তবে তুমি গোপার বাবা মা-র কাছে কথা দিতে পার।

আসলে অসীম কখনো নিজের সম্পর্কে তেমন করে কোনদিন-ও চিন্তা করেনি। নিজের মনটা নিয়ে তেমন করে ভাবেনি—প্রয়োজন-ও অনুভব করেনি। হাল্কা হাসিখুশী, এবং হাল্কা ভাবে জীবনটা কাটিয়ে যাওয়াতে-ই তার অভিরুচি এ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে। তার জীবনে গভীর কোন অভিজ্ঞতা নেই। এক তার মায়ের মৃত্যু। সে স্মৃতি তার মনে বেদনাকরুণ একটা পটভূমি সৃষ্টি করে রেখেছে মাত্র। সে স্মৃতিতে বেদনা বোধ হয়। এবং বাবার দিকে চেয়ে এ-ও অসীম বোঝে, তার চেয়ে ঐ মানুষটির জীবন শূন্য হয়ে গেছে অনেক বেশী। তার জীবনে, তার মা যখন গেছেন, তখন শৈশব ও বাল্য অতিক্রান্ত। মায়ের প্রয়োজনের গণ্ডী অনেকখানিই সে কাটিয়েছে। তিনি না থাকায় খানিকটা শূন্যতা তার-ও জীবনে বোধটা এসেছে বটে—কিন্তু মনে হয় যেন কালের প্রলেপ সে শূন্যতার গহ্বরটা ভরে এনেছে অনেকখানি।

দু'তিনদিন ধরে নিজের মনটাকে বুঝতে চেষ্টা করলো অসীম। উৎসাহ বা নিরুৎসাহ কোনটা-ই খুব বেশী খুঁজে পেলনা মনে। গোপা মন্দ নয় বেশ। নিয়ে চলবার ফিরবার মতো খানিকটা গুণপনা তার আছে-ই। বিয়ে যখন করতে-ই হবে—তখন করলে-ও হয়। আর, অসীম জানে—সে বিয়ে করলে তার বাবার নিঃসঙ্গতা অনেকটা ঘুচবে। গোপা নিশ্চয় তার বাবাকে-ও ভালোবাসতে পারবে।

বাবা ভেবেছিলেন ছেলের কথা, আর ছেলে ভেবেছিলো বাবার কথা—এর থেকে-ই বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হলো।

কিন্তু শেষ অবধি সেদিনকার ঘটনায় শুধু যে প্রস্তাবনার ব্যাপারটা থেমে গেল তাই নয়। অসীমের মনের মধ্যে-ও কোথায় যেন কি থেমে গেল। ঢিল পড়লে যেমন জল কেঁপে ওঠে—অসীম-ও যেন এই ঘটনার আলোড়নে নিজের মনের গতিবিধি দেখে অবাক হয়ে গেল। তার ধারণা ছিল না, যে তার মনে এত গভীরতা আছে, বা সে-ও কোনো একটা নির্দিষ্ট চিন্তা ধরে এত তলিয়ে ভাবতে পারে।

অসীমের এই পরিবর্তন, গাম্ভীর্য আর কপালে দুশ্চিন্তার রেখা, এগুলো দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সকলে। সকাল থেকে বন্ধু আত্মীয়দের আনাগোনার শেষ নেই। সুষমা, তাঁর মেয়ে নন্দিতা দু'জনেই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বেশ খানিকটা সময় কাটান। প্রকাশবাবু, সুনলিনী আর গোপা-ও আসেন।

কিন্তু ওঁদের সঙ্গ এড়িয়ে এক্ফাঁকে বেরিয়ে আসে অসীম। এমনিই একটু রাস্তায় হেঁটে আসে। নয়তো ট্যাক্সি নিয়ে চলে যায় লেকের দিকে, বা ময়দানে। শুভাকাঙ্খী মানুষগুলোকেও ইদানীং অসহ্য লাগছে তার। ভালো লাগছে না সুনলিনী আর সুষমার এই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা। আর গোপা? এই দুর্ঘটনায় তার মনের অবস্থা এমন হয়েছে, যে কোন কিছুই যেন ভালো লাগছে না। গোপা তো কই এগিয়ে এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছেনা। গোপা এখনো তেমনি আলগা হয়ে নিজের সাজসজ্জাটুকু হাসিটুকু নিয়েই যেন মেতে রয়েছে। অসীমকে সে আজই অনুযোগ করেছিল—কই, তোমার মুখে হাসি নেই, কথা নেই, ভালো লাগছে না আমার। তুমি এমন কেন? হাসতে পারো না? সহজ হতে পারো না?

কেন এই সময়ে গোপা এইসব হাল্‌কা হাসিখুশি দূরে সরিয়ে রেখে বেশ সমবেদনা নিয়ে বন্ধুজনের মত এগিয়ে আসতে পারে না? না কি সুখ, আনন্দ আর হালকা খুশির দিনেরই সঙ্গিনী হতে পারে গোপা? কোনো বেদনাহত গভীর মনের প্রয়োজনে দুঃখটুকুর ভাগ সে নিতে পারে না?

অসীমের বন্ধুরাও বলে তাকে। বলে—তুমি কি যে ভাবছ মৈত্র? আরে, একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছো! এই রায়কে দেখ, সে রাঁচি রোডে সেবার কি কাণ্ডটা করলে!

রায় বলে—অসীম, বাঁচতে গেলে নার্ভ চাই, জানলে? নার্ভের জোর থাকা চাই।

তারপর কেস্ যেদিন সত্যিই ওঠে আদালতে, দেখা যায় সকলের কথাই ঠিক। অসীমের এতখানি দুশ্চিন্তার কোন কারণই ছিলো না। অসতর্ক এক গাড়িচালক, আর এক নির্বোধ পথিকের যে সংঘর্ষ হয়েছিলো, তাতে আদালত গাড়িচালকের কোন দোষই দেখতে পান না। দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বিচার করেও জানা যায়, যে দোষ যা ছিলো তা পথিকেরই ছিলো। তদ্বির-তদারকের কোন প্রয়োজনই ছিল না অসীমের হয়ে। কেননা ইন্‌সপেকটর এবং বিটের পুলিস, সকলেই বলেন, ভদ্রলোক সহসা এমনভাবে রাস্তা পেরোতে চেষ্টা করেছিলেন, যে অসীমের সাবধান হবার কোন অবকাশই মেলেনি।

পাঁচশো টাকা জরিমানা, সেই টাকা মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ আর ভবিষ্যতে সাবধান হবার জন্য অসীমকে সতর্ক হবার নির্দেশ দিয়ে বিচার শেষ করেন বিচারক।

আশ্বস্ত হন সুরেশ। ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে সহসা চোখ পড়ে যায় অসীমের। একটি বছর দশেকের ছেলে। তার নগ্ন পা, খালি গা, দেখে বুঝতে দেরি হয়না যে অশৌচের গুরুদশা

তার। বড় বড় দুটি অসহায় ও ভয়ার্ত চোখ চেয়ে আছে অসীমের দিকে। এই মানুষটাই তার পিতার মৃত্যুর কারণ এই বুঝে তার এক ভয়ার্ত কৌতূহল ফুটে উঠেছে চোখে। তারই হাত ধরে দাঁড়িয়ে আর একটি ছেলে। অসীমদেরই সমবয়সী হবে। জোয়ান চেহারা। শার্ট আর ধুতি পরণে। সে অসীমের দিকে চায়। চোখে ফুটে ওঠে একটা ঘৃণা। অসীমের মনে হয় সে দৃষ্টিতে বুঝি চাবুক আছে। কোনমতেই তাকিয়ে থাকতে পারবে না সে। বোঝে, ঐ ছেলেটি আর যুবকটির চোখে সে আজ হত্যাকারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাত দু'খানায় রক্ত নেই। তবু সে আজ খুনী। এ অপরাধ সে স্খালন করবে কেমন করে? কাকে বোঝাবে তার কথা?

বাড়ীতে ছিলো একটা ছোট উৎসবের আয়োজন। এই আসন্ন বিপদ মুক্তিতে আনন্দিত হয়েছেন সকলে। আর অসীমের সঙ্গে ভাগ করে নিতে এসেছেন সেই আনন্দ। কিন্তু অসীমেরই আজ যেন কিছু ভাল লাগলো না।

একটু পরে সে নিঃশব্দে উঠে আসে নিজের ঘরে। ঘর পেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নিজের দিকে। একেই কি বলে দুঃখবাদী মন? তার মনটা যে এইরকম তা তো জানতোনা অসীম। একটা ছোট ছেলের ভরসাহারা শঙ্কিত চাহনি তার মনে ঘা দেয় কেন বারবার? অজ্ঞানে, অনিচ্ছায় সে এ কি অপরাধ করলো? কেমন করে ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়ে অন্য একটি পরিবারের মাথায় নামিয়ে আনলো দুর্ভাগ্য? ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বেরিয়েছিলেন? মনটা কি এমনই বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিলো, যে কোনদিকেই খেয়াল ছিলোনা তাঁর?

—বা রে, তুমি অমনি উঠে এসেছো?

গোপা এসে দাঁড়িয়েছে। অসীম বলে—হ্যাঁ। এসো। ভাল লাগছে না অত কথাবার্তা, অত হট্টগোল।

—কেন তুমি অত ভাবছ বলো তো ? কি যেন হয়েছে তোমার। আকাশপাতাল কি ভাবছ দিনরাত। কেমন যেন হয়ে গিয়েছ তুমি। মোটেই আর সে রকম নেই।

—বদলে গিয়েছি, তাই না গোপা ? এত বদলে গিয়েছি, যে চিনতে পারছো না।

—তুমি যেন কেমন করে কথা বলছো।

এখন গোপার গলায় খুব অভিমানী সুর। অসীম বলে—তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না গোপা, আমি মানুষটা-ই হয়তো এইরকম।

—কি যে বলছ, একটু-ও ভালো লাগে না। মা বলছিলেন।

—কি বলছিলেন ?

—যে অসীম বড়ই moody ছেলে। এ রকম হবার কোন মানে হয় ? কোথাকার কে না কে চাপা পড়েছে·········এ রকম এ্যাক্‌সিডেণ্ট ত কলকাতায় হরদম হচ্ছে।

—হরদম হচ্ছে ?

হঠাৎ অসীম যে এ রকম রেগে যাবে তা অসীম-ও বুঝতে পারেনি। সে চেঁচিয়ে বলে

—রোজ যদি হাজারটা-ও হয় তবু হাজারটা মানুষের প্রাণ চলে গেল, বুঝলে ? মানুষের প্রাণ! এ হলো জীবনের কথা।

গোপা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর

—যাও!

ব'লে গলায় অভিমানী সুর টেনে ভেতরে চলে যায়।

কিন্তু সুনলিনীর মেয়েকে ধমক দেওয়া অত সোজা নয়। সুনলিনী বলেন সুষমা-কে। সুষমা আসেন ছুটতে ছুটতে। বলেন

—অসীম, গোপা যে বড্ড সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে—ওর সঙ্গে অমন রূঢ়ব্যবহার করেছিস কেন ? মেয়ে সেদিন কেঁদে কেটে খুন হয়েছে। মনটা ওর ভারী নরম কিনা ?

অসীম বলে

—তাহ'লে এখন আর ওঁদের এসে কাজ নেই। কেননা অত মনমেজাজ বুঝে চলবার মতো অবস্থা এখন আমার নেই। আমার মনমেজাজ ভাল হোক তখন না হয় খবর দেব।

এ সময় যদি তার কারুর সঙ্গ ভাল লাগে তো সে অঞ্জনা। এমনিতে-ই পিসী ভাইপো মাত্র তিনবছরের ছোটবড়। অঞ্জনা ছোটবেলা অসীমের সঙ্গে ঝগড়া করে তার মা-কে ভাগ করে নিতো। এখন-ও সে অসীমের স্নেহময়ী একটি বড় বোনের মতো।

গোপার সঙ্গে বিয়ের কথাতে এক অঞ্জনা-ই কোন কথা বলেনি। তার স্বামীর কাছে সে বলেছিল

—বৌদিদি-র যে পুত্রবধূ হবে, তাকে কি অমন চট করে নির্বাচন করা যায় ? তেমন মেয়ে কোথায় ?

অঞ্জনার নিজের জা-এর বোন এবং তা ছাড়া-ও শ্বশুরবাড়ীর গণ্ডীর আওতায় আরো মেয়ে ছিলো। অঞ্জনা উদ্যোগ করলে-ই তাদের কারু সঙ্গে অসীমের বিয়ে হতে পারতো, এ-ই ছিল তাঁদের ধারণা। অঞ্জনার যে অসীমের জন্যে কারুকেই পছন্দ নয়—এ জেনে তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। গোপার সঙ্গে বিয়ের ঠিক হওয়াতে তাঁরা এমন কথা-ও বলেছিলেন

—এমনিই কি ভালমেয়ে ? আমাদের শীলা কি এতই খারাপ হতো ?

অঞ্জনা মনে দুঃখ পেয়েছিল কি না জানা নেই। তবে মুখে সে কিছু বলেনি।

আজ অসীমের অঞ্জনার কথা মনে হয়। সে হঠাৎ ছাত্রজীবনের মতো ছেলেমানুষী করে বসে। অঞ্জনার বাড়ীতে অন্যান্য লোকজন ও আছেন তেমন করে তাকে পাবে না, তা জানে অসীম। সে তাই ফোন করে অঞ্জনাকে। বলে

—চলে এসো শীগগির। সারাদিন থাকবে, রাতে আমি পৌঁছে দেবার ভার নিচ্ছি।

—কেন, খোকা? বড়দা-র শরীর খারাপ?

—না। তোমাকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। আসবার সময় বটে-টাকে অবিশ্যি এনো।

অঞ্জনা কিছুক্ষণ বাদে-ই ছোট ছেলেটাকে নিয়ে চলে আসে এখানে। আসবার সময় নিচে বাগানের মুখে-ই পায় অসীমকে। অসীম বলে

—পিসী তুমি কিন্তু বাবাকে ব'লোনা যে আমি তোমায় আসতে বলেছি। ব'লো, এমনি এসেছি।

অঞ্জনা হাসে। ছোটবেলা থেকে এইভাবে অসীমের গোপন কথা কম রাখতে হয়নি তাকে। ওপরে এসে যখন দাঁড়ায়—বলে

—সারাদিনের জন্যে এলাম। কি সংসারে-ই দিয়েছিলে বাবা, এতটুকু সময় পাই না। সারাদিন বিশ্রাম করব, জানলে?

অঞ্জনার ছোট ছেলের সবে চার বছর হলো। মূর্তিমান শৈশব। ঝাঁকড়া চুলের নিচে চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে। সুরেশের সঙ্গে তার নিমেষে ভাব হয়ে যায়।

অঞ্জনা অসীমের ঘরে গিয়ে বসে। বলে

—কি ব্যাপার বল্‌তো? এরকম জরুরী এত্তেলা কেন?

—কেন আবার, না ডাকলে কি তুমি আস?

—বল্ কি হয়েছে?

অঞ্জনার মধ্যে কি যে পায় অসীম, কেমন যেন সহজ ও স্বচ্ছন্দ

বোধ করে। সে অঞ্জনাকে আস্তে আস্তে অনেক কথা বলে যায় মনদিয়ে শোনে অঞ্জনা। তারপর বলে

—আমার মনে হয়, মনের এ অবস্থায়, তুই চট করে বিয়ে করিস না। তুই নিজে-ই ত' প্রস্তুত নস খোকা।

—ওঁরা জোর করছেন। আমার কিন্তু, সত্যি বলছি, এখন ও সব মোটে ভাল লাগছে না। তা কি ওঁরা বুঝবেন?

—আমি সুষমা দিদিকে বলবো। তিনি ঠিকই বুঝবেন মনের একটা খারাপ অবস্থায় জোর করে-ও লাভ নেই।

সুরেশকে বলে অঞ্জনা। বলে—ঐ এ্যাকসিডেন্টটা, যে কোন কারণে-ই হোক, ওর মনে দাগ কেটেছে। ওর মন ভালো নেই এখন-ই বিয়েটা নিয়ে জোর করাটা ঠিক হবে না।

—কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে এত ভাবে কেন খোকা? এত ভাববার কি আছে?

অঞ্জনা চোখ তোলে। বলে

—একেবারে মায়ের স্বভাবটি পেয়েছে। মনে নেই তোমার সেই যে নিমাই কাজ করতে এসে শুধু ফাঁকি দিত? আজ বলতো গায়ে ব্যথা কাল বলতো জ্বর হয়েছে।—তাকে বৌদি একবার জ্বর হয়েছে গায়ে ব্যথা এ কথা বললে-ও বললেন যে ন ফাঁকি দিচ্ছে। ওকে জোর করে পাঠালেন ইস্কুলে টিফিন দিয়ে তারপর সত্যিই জ্বর বেড়ে যখন বেশী অসুখ দাঁড়াল—বৌদির কি মনস্তাপ, মনে পড়ে তোমার?

সুরেশ আশ্চর্য হয়ে যান। অঞ্জনার মুখের দিকে চেয়ে মনে পড়ে যায় লক্ষ্মীর কথা। সত্যিই তো! এমন করে বিস্মৃত হয়ে তিনি ছিলেন? অঞ্জনার দিকে দিকে চেয়ে যেন তাঁর লজ্জা বোধ হয়।

অঞ্জনা আস্তে আস্তে বলে

—খোকার ওপর জোর ক'রোনা বড়দা। ও যখন নি

মনথেকে সায় পাচ্ছে না তখন তোমাকে আরো বুঝতে হবে। ও বলে, যার সঙ্গে বসে দশ মিনিট কথা কইতে পারি না—তার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটবে কেমন করে, বুঝতে পারি না পিসী।

অঞ্জনার কথায় কোন অভিযোগ নেই। তবু সুরেশের মনে হয় তাঁকে তাঁর অক্ষমতা-টা কোথায় তা জানিয়ে দিচ্ছে অঞ্জনা। বুঝিয়ে দিচ্ছে, যে অসীমকে তিনি অসীমের এই বিভ্রান্তির সময়ে ঠিক ঠিক বুঝতে পারছেন না।

অসহায় বোধ ক'রে তিনি বলেন

—অঞ্জন, তবে সে কথা দিলো কেন? তাঁদের দিক থেকে যদি দেখ, তাহলে বোঝ, কি রকম হচ্ছে ব্যপারটা।

অঞ্জনা বুদ্ধিমতী মেয়ে। একথা বলেনা, যদি-ও সে ভাল করে-ই জানে, যে বিয়েটা ঘটবার জন্যে অপর পক্ষের সচেষ্ট প্রস্তুতি কিছু কম ছিল না। একথা বলে না এই কারণে, যে তাহ'লে খানিকটা ছায়া সুষমার ওপরে-ও এসে পড়ে—আর সুষমা ত' লক্ষ্মীর-ই বোন। তার কোনো কথাতে যদি একটুকু অমর্য্যাদা হয় সুষমার? সে অঞ্জনার ভালো লাগবে না। সে বলে

—বুঝলাম, সেটা তার ভুল হয়েছে। কিন্তু সে যা বলতে চায় তা-ও তুমি শোন। সে বলতে চায় যে তার মনের দিক থেকে গোপা তার কাছাকাছি আসতে পারবে কিনা সে বিষয়ে তার একমাস আগে অবধি কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু এখন, তার মনের অবস্থা আর ঠিক সেরকম নেই। সে বলতে চায়, গোপা যে রকম ছিল সে রকম-ই আছে—যদি কিছু বদলিয়ে থাকে, ত সে বদলিয়েছে। তার মনে হচ্ছে এ সম্পর্কের জের টানলে অন্যায় হবে। গোপার ওপরে-ও অবিচার করা হবে।

—সুষমা কি বুঝবে?

—নিশ্চয় বুঝবেন? সুষমাদি কি খোকাকে কম ভালো-

বাসেন ? সবচেয়ে বুঝতে হবে তোমাকে। খোকা যদি বা ভুল একটা করে থাকে—সেটাকে সারাজীবন টানবার দরকার কি বল ?

—তবে কি করবো অঞ্জু, তুই-ই বল।

—আমি বলি বড়দা তাঁদের বল এখন খোকার মন ভাল নেই এখন স্থগিত থাক। তুমি-ও দেখ। যদি ওর মনের এ অবস্থাটা কেটে যায়—ভালোলাগে তাহ'লে হবে বিয়ে। আর যদি না হয় ত না-ই হোক। ওকে ভাই বলে অসুখী করবার কোন মানে হয় না। আরো কি জান ? এ সব জিনিষ নিয়ে ঠিক জোর খাটে না।

—বেশ তো অঞ্জু তুই বলছিস ঠিকই বলছিস। কিছুই বলবার নেই আমার। সত্যিই জোর করবাব কোন কথা-ই ওঠে না। মানে হয় না। যাক আমি না হয় ভাল ক'রে বলবো ওকে—সুষমাকে-ও বলবো। সুষমা নিশ্চয় বুঝবে।

—বুঝবেন বড়দা। অসীমকে উনিই কি কম ভালোবাসেন ?

॥ পাঁচ ॥

মনের এই আলো-আঁধারি ভাবটা ক'দিন ধরেই অন্যমনস্ক করে রাখে অসীমকে। কেমন যেন মনে হয় অসীমের, বেশ চলেছিলো একটা সিঁড়ির ধাপ ধরে ধরে, হঠাৎ যেন মাঝপথে কটা ধাপ সরে গিয়েছে। কেমন যেন হয়ে গিয়েছে সব।

এমনিধারা খামখেয়ালী একটা ছন্নছাড়া ভাবের বশেই সেদিন অসীম একটা দুঃসাহসিক কাজ করবার সঙ্কল্প নেয়। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক করে। যদি সে যায় সেখানে, তবে লোকে তাকে কি বলবে? লোকে যাই বলুক না বলুক, সে নিজেই তো এই ধরণের কোন কাজ করতে দেখলে ভাবপ্রবণ, সেন্টিমেন্টাল এসব না বলে ছাড়তো না ক'দিন আগেও। কিন্তু ক'টা দিন আগে আর পরে অনেক তফাৎ হয়ে গিয়েছে। অসীম নিজেই আর সে মানুষ নেই। সে ক্ষমা চাইতে যাবে। হয়তো সেটা-ও একটা স্বার্থপর চিন্তা। মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর কি না? অসীম হয়তো একান্ত এক স্বার্থপর মনোভাব থেকেই যেতে চাইছে সেই বাড়ি। মনের ভেতরের গুরুভারটা, বিবেকের সে দংশনটা তাকে নিরন্তর আঘাত করেছে। তাকে বদলে ভেঙেচুরে একটা অন্য মানুষ বানিয়ে ফেলেছে। অসীম তার এই নতুন মানসের হাত থেকেই মুক্তি চায়। সে মনটা সহজেই এবং আমোদ-প্রমোদের সাধারণ উপকরণ নিয়েই মেতে থাকতে জানতো। অন্ততঃ সে মনটা এমন ছিলো না, যে সহসা নিজের জীবনটা অকিঞ্চিৎকর মনে হয়, আর দায়ভারহীন হাল্কা খুশির জীবনে বিতৃষ্ণা আসে।

তার নিজের মনটা আর তার আশ্চর্য গতিবিধি দেখে অসীম আশ্চর্য হয়েছে। সে যদি একবার যেতে পারে সেখানে—ক্ষমা চাইতে পারে—(এখন ও অসীম ভাবছে ক্ষমা এমন বস্তু যাতে কোন অর্থব্যয় নেই, এবং যা সে চাইলেই পাবে) ক্ষমাটা পেলে-ই তাই এই মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের হাত থেকে সে মুক্তি পাবে।

গোপার দায় থেকে তাকে মুক্ত করেছেন সুরেশ। অপ্রীতিকর সে ঘটনার ঝামেলা সবটুকু তিনি নিজে নিয়েছেন। সে জন্য খুব কৃতজ্ঞ অসীম সুরেশের কাছে।

যতদিন ধরে সুরেশ সুষমা ও বরেনবাবু-কে ডেকে কথা বলছিলেন—প্রকাশবাবুদের জানাচ্ছিলেন, এইসব ঘটনা যখন চলছিলো, অসীম তখন খুব একটা দোষী দোষী মুখ ক'রে ঘোরাফেরা করছিল। দেখে সুরেশের মনটা কি রকম করেছিল। তাঁর মনে পড়েছিল ছোটবেলা না জেনে স্কুলে এর কথা সরলভাবে ওর কাছে বলে, কি রকম একটা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল অসীম। সে গোলমালের ধাক্কা বাড়ীতে-ও পৌঁছিয়েছিল। সুরেশ-ই এগিয়ে গিয়ে মাস্টারের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত গোলমালটা মেটান। তাঁর মনেপড়লো, সে সময়-ও অসীম এমনি চোরের মতো মুখ করে-ই ঘুরতো আশপাশ দিয়ে। আর সবটা যখন মিটে গেল, তখন সে এসে তাঁর হাঁটুতে হাত রেখে হাসিমুখে তাকিয়েছিল। এখন-ও যখন সমস্যাটা সুষ্ঠুভাবে-ই মিটলো, তখন অসীম বাবার কাছে এসে হাসিমুখে চেয়ে রইলো। বোঝা গেল, যে ওর বয়স সাতাশ না হলে ও আরো কাছে এসে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়াতো।

সুরেশের মনে হয়, আজ ও অসীম তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের অপেক্ষা রাখে।

অসীম এবার ত' অনেকটা হাল্কা হতে পারে ? তবু পারেনা। অসীমের মনে হয় সে নিজের কাছে হেরে যাচ্ছে।

নিজেকে তিরস্কার করে অসীম। সকালবেলা উঠে পড়ে ঝরঝরে মন নিয়ে। উঠে খবরের কাগজটা খুলতে না খুলতে বাবার ঘর থেকে হাঁকডাক শুরু হয়—খোকা! আমার পেন্‌সিল কোথায় ? পাচ্ছিনা কেন ?

সকালবেলা সুরেশের ঘরে এক এলাহি ব্যাপার। তাঁর খাটের সঙ্গে লাগাও শেল্‌ফে স্কুলের কাজের খাতা, বই, ফাইল। কয়েকখানা গল্পের বই, তিন চারটে ল্যাম্প। পেন্‌সিল, ছুরি, কলম, পিনকুশন, পাথরের কাগজ চাপা—তা-ও হাতের কাছে চাই। চা-এর ট্রের পাশাপাশি আর একটা ট্রেতে চাই দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খুঁটিনাটি নতুনত্ব করতে সুরেশ খুবই ভালবাসেন। সকালবেলা তাঁর মতে একসঙ্গে সবগুলো কাজ শুরু করা দরকার। তাতে নাকি চমৎকার স্টার্ট পাওয়া যায়। পুরো দিনটা ধরে নানারকম কাজ করা যায়।

অসীম এসে উপস্থিত হয়। সুরেশ বলেন—দেখছো কি সর্বনেশে কাণ্ড ?

চোখে চশমা দিয়ে তাকিয়ে আছেন একটা কাগজের দিকে। অসীম বলে—কি হলো ?

—দেখ, কি সব ব্যাপার ?

—কি হলো বলবে তো ?

—একশোবার বলবো! লাল পেন্‌সিলটা কোথায় ?

—তোমার কানে গুঁজে রেখেছো।

—অ!

ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে সুরেশ কাগজটা তুলে দেন। বলেন—ইস্কুলের লাইব্রেরির জন্যে বইয়ের লিস্ট করতে দিয়েছিলুম।

তোমার মোহিনীবাবুর কাণ্ড। তখনই বলেছিলুম খোকা মোহিনীবাবুকে স্কুলের কাজে নিওনা। অফিসের ডেসপ্যাচে রাখো!

—হ্যাঁ, তা আমিই জোর করলুম। তো কি হলো?

—দেখ তার লিস্ট! আরে বোঝ না? মুখে পান নিয়ে যে কথা বলে সে লোকটার কখনো দায়িত্ববোধ থাকতে পারে?

—কি, বাজে লিস্ট হয়েছে?

—হয়নি? বোম্বাইয়ে নারীডাকাত, আর চীনসাগরে মৃত্যুলীলা আর যতরাজ্যের আগড়ুম-বাগড়ুম—তাও আবার তিনকপি করে? সব কেটে দিয়েছি আমি।

—কিন্তু কেনা হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদিকে আবার তড়িঘড়ি কাজ করা চাই তো? তা কেনা হয়ে গিয়েছে, বইগুলো যেন আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। তুমি একটা ভালো লিস্ট করতে বলো না, তোমার বন্ধুকে—সেই যে দাড়ি কামায় না যে ছেলেটা?

—চা খেয়েছ?

—খেলুম আর কোথায়? তুমি দেরি করছ এমন।

অসীম চা ঢেলে দেয় বাবাকে। বলে—বিস্কুট খাও।

এতক্ষণে সুরেশের খুব আরাম বোধ হয়। চা-এ চুমুক দিতে দিতে বলেন—বুঝলে খোকা? সেই লম্বাঝুলের পাঞ্জাবি পরা বন্ধুটিকে ডেকে আনো। তাকে দিয়ে আমি ক-খানা ছোটদের বই লেখাই। বুঝেছ? এসব হলো সমস্যা।

অসীম বলে—ব্যাপার কি বলো ত'? খুব যেন উত্তম দেখা যাচ্ছে সকালেই?

কাগজ রেখে দিয়ে সুরেশ মিটিমিটি হাসেন। বলেন—নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে আবার এক হতে হবে। বুঝলে কিছু? কি

বুঝবে ? উঠলে বেলা করে। উঠেই কতকগুলো চা গিললে গরম গরম—যা প্রকৃতি বিরোধী।

—তারপর ?

অসীম আরো চা ঢালে, তাতে যথেচ্ছ দুধচিনি মেশায়। সুরেশ বলেন—না না, আমি লক্ষ্য করেছি তুমি কোন সময়-ই নেচারের কথা ভাবনা। অথচ, যদি তলিয়ে দেখতে চাও, তো দেখবে—

—কি দেখব ?

—কি আর বলি! জন্মকালটা কাটিয়ে দিলে কলকাতায়। কতবার বলেছি এবার জমি কেনো ঐ সব ডায়মণ্ডহারবার রোডের আশপাশ দিয়ে। কয়েক বিঘা জমি—সেখানে গাছ হয়, ফুল হয়, রোদ পড়ে—ভাবতে পার ?

অসীম রুটিতে মোটা করে মাখন লাগায়। বলে

—ডায়মণ্ডহারবারের কোথাও গাছের ওপর রোদ পড়েছে, এ আর ভাবতে পারবনা কেন বলো ?

—খোকা হাল্কা ক'রোনা সব কিছু। মানুষকে যদি আজ, সভ্যতার অভিশাপ এই সব রাজ্যের অসুখ বিসুখের হাত থেকে বাঁচতে-ই হয়—তবে নিশ্চয় জেনো—নেচারের যে সব স্বাভাবিক ওষুধ বিষুধ আছে, তার আশ্রয় নিতেই হবে।

—বুঝেছি।

—কি বুঝেছ ?

—ঐ প্রকাশবাবু।

—কি বলছো ?

—প্রকাশবাবু মাথায় ঢুকিয়েছেন কিছু।

হাসতে থাকেন সুরেশ। বলেন—ঐ তো তোমার দোষ মোটেই শুনতে চাওনা। শুধু কইতে চাও। আসলে ভোরটা স্টার্ট

করা উচিত এমন কিছু দিয়ে, সেটা আমাদের শরীরকে বেশ সাহায্য করে···যেমন শিউলীপাতার রস। অথবা উচ্ছের রস।

এতক্ষণে সুরেশের খাটের নিচে একটা গ্লাসে ঘনসবুজ তলানি চোখে পড়ে অসীমের। গ্লাসটা সে সুরেশের প্রবল আপত্তি সত্বেও তুলে ধরে শোঁকে। তারপর বাবাকে বলে

—তুমি সকালে উচ্ছের রস খেয়েছো ?

—নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথ নিমপাতার রস খেয়েছেন একসময়।

অসীম হাঁকাডাকি করে—বিশুদা ! বিশু-দা !

বিশ্বনাথ কোনসময়ই তাড়াহুড়ো করে না ! তাড়াহুড়ো করা তার স্বভাববিরোধী। শার্ট ও ধুতি পরা অতি গম্ভীর চেহারা। ধীরেসুস্থে সে আসে। অসীম বলে—তোমাকে বলেছি না বাবার কথামতো ঐ ছাই-পাঁশগুলো খেতে দেবে না ?

বিশ্বনাথের চোখের সামনে সুরেশবাবু নেহাতই মিইয়ে যান। বলেন—আবার বিশ্বকে টানছ কেন ? ও কি জানে !

বিশ্ব বলে—আমি দিইনি বাবু। বিশ্বনাথের বুকে তেমন পাটা নেই যে আজ নিমপাতার রস কাল ইসবগুল আর পরশু উচ্ছে ছেঁচে আনবে। তোমার ঐ ছোকরাটা যাকে অফিস থেকে এনেছো !

সুরেশবাবু বেগতিক দেখে—এঃ, তিব্বত নিয়ে তো মহা সমস্যা পাকালে এরা !—বলে কাগজের মধ্যে ডুবে যান। একথা-সেকথার পর অসীম বলে যায়—দুপুরে বাড়িতে খেতে আসব। একসঙ্গে খাব, বুঝলে বিশ্বদা ?

সকালটা ভালই শুরু হয়ে। অফিসে চলে যায় অসীম। আর অনাথ-আশ্রমের বিষয়ে কথাবার্তা কইতে দু'জন স্বামীজি আসেন। উঠে পড়েন সুরেশবাবু। সকালবেলা ছেলের সঙ্গ পেলে তাঁরও ভাল লাগে খুব।

অফিসে বসে আজ কেন যেন সারাদিনটা ভালোলাগে অসীমের। মনটা হাল্কা। বেশ ঝরঝরে ভাব। আর ভাবনা কি? দুদিনের মধ্যেই একবার সে যাবে সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতে।

মনটা যখন ঠিক্ করেই ফেলেছে, তখন আর ভাবনা কি? ভালোই লাগছিলো অসীমের। বাড়ি ফিরে ও টপটপ করে সিঁড়ি টপকে উঠলো। হাত ধুয়ে খেতে এলো যখন, মনে হলো যেন বাবা একটু অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছেন। প্রথমটা খেয়াল করেনি। মুখে দিয়ে বলেছিলো—বাঃ, চমৎকার হয়েছে তো মাছটা! রান্না শিখে ফেলেছে লোকটা, কি বলো বিশ্বদা?

সুরেশ একটু অন্যমনস্ক ও ঈষৎ গম্ভীরভাবে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন—খোকা, কোর্ট থেকে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অসীমের মুখে খাবার বিস্বাদ হয়ে গেল। হাতটা আর উঠলো না মুখে। বুকের ভেতরটায় যেন কি কামড়ে ধরলো, হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে শুরু করলো জোড়া তালে।

সুরেশও নেহাতই বিমনা হয়েছেন। তাই ছেলের হাসি মুখখানা যে কালো হয়ে গেল তা তো তাঁর নজরে পড়ছে না? সুরেশ বলেন—ভেবেছিলুম সব চুকে বুকে গেছে রে। কিন্তু কোর্ট থেকে ফেরৎ পাঠিয়েছে সেই চেক। তারা টাকা নেয়নি খোকা।

—ও।

আর কিছু বলে না অসীম। অন্যমনস্ক আঙুলগুলো প্লেটের ওপর আঁকিবুকি কাটে। তারপর কোনদিকে না চেয়ে জল খেয়ে উঠে পড়ে অসীম। খাবার ঘরের কোণাতেই বেসিন। হাত ধুতে ধুতে বলে—আমার হয়তো ফিরতে দেরি হবে। তুমি যেন অপেক্ষা কোর না।

অসীম বেরিয়ে গেলে বিশ্বনাথ সুরেশকে বলে—ছি ছি। তুমি কি

—অ্যাঁ। আমায় বললি ?

—বলবো না।

বিশ্বনাথ অনাস্বাদিত পাত্রগুলো তুলতে তুলতে বলে—বলতে তোমাকে চাইনা বড়বাবু, তবু তুমি আমার মুখ দিয়ে বলালে কথাগুলো। খোকাবাবু ক্ষিদের মুখে খেতে বসেছিলো, তখনই চিঠির কথা না তুললে হতো না ? খেতে দিলে না ? না খেয়ে চলে গেল !

সুরেশ সজাগ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ততক্ষণে চলে গিয়েছে অসীম।

অসীমের মুখেচোখে যেন অদৃশ্য এক শাস্তিদাতার চাবুক পড়েছে। কালো হয়ে গিয়েছে মুখ। নিজেকেই শত শত তিরস্কার করে অসীম। দুর্ঘটনার পর মাসদেড়েক মাত্র কেটেছে। এর মধ্যেই তো সেই শোকাহত পরিবারবর্গ সব ভুলে যায়নি। তাই কি তারা টাকা ফেরত দিয়েছে ? প্রিয়জনের জীবনের দাম অমন টাকা দিয়ে মাপা যায় না, তাই কি তারা বলতে চায় ? কে বলে দেবে অসীমকে ? প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসাগুলো তাকে ক্ষতবিক্ষত করে।

অফিসে গিয়ে আর কাজে মন বসে না। বিকেল হয়ে যায়। অফিস থেকে সবাই চলে যায়। সে বসেই থাকে টেবিলে। সকাল থেকে যে নিশ্চিন্ত এবং হাল্কা ভাবটা ছিল মনে—সেটা চলে যায়। মনটা আবার তাকে কষ্ট দেয়। এত কষ্ট দেয়, যে গলার বোতামটা খুলে দেয় অসীম—মাথাটা নিজেই টিপে ধরে। যেন এ যন্ত্রণাটা মনের নয় শরীরের—এবং এই ভাবে চেষ্টা করলে যন্ত্রণাটা কমে যেতে-ও পারে।

তাঁরা যদি টাকাটা নিতেন, তবে অসীম যেতো—ক্ষমা চাইতো বোঝাতে চেষ্টা করতো—এবং সে যে কোন বালকের মতো-ই নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিল, যে ক্ষমা সে পাবে-ই।

অসীম এখন বোঝে, যে না, ব্যাপারটা অনেক গভীরে চলে গেছে এবং এখন ও যাচ্ছে। সে ভদ্রলোক নেই। কোর্ট মীমাংসা করে দিয়েছে। টাকা গিয়েছিল। টাকা ফেরত দিয়েছে তারা। এ গুলো সবই ঘটনা এবং বাইরে থেকে দেখতে গেলে এ-ও বলা চলে, যে ঘটনা ঘটেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু অসীম এখন বুঝতে পারে, পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে বাইরে। এ দিকে ঘটনা সবে স্বরু। বাইরের ঘটনা-নিরপেক্ষ ভাবে স্বরু হয়েছে এক আবর্ত। আবর্তটার পাক সবে স্বরু হয়েছে, এবং অসীম বোঝে, যে তার-ও জড়িয়ে না পড়ে উপায় নেই। সে অনেক আগেই জড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই, যে তারা তাকে এখন ও হত্যাকারী বলেই মনে করে—অথবা ভাবে যে এতবড় ক্ষতিকেও যে পূরণ করতে চায়, সে এক চূড়ান্ত দাম্ভিক মানুষ। টাকার জোরে নিরাপদ ভাবে বেরিয়ে গেল।

যে নিরাপত্তার জন্য তার মনটা উদ্‌গ্রীব ছিলো—অসীম দেখে, সে নিরাপত্তা তাকে এতটুকু স্বস্তি বা শান্তি দেয়নি। এবং কোন সমাধান-ই হয়নি। এখন তাকে যেতে হবে—দরকার হয় বারবার যেতে হবে। একটা কোন সমাধান করতে-ই হবে।

কেননা নইলে সে নিজে বিপন্ন। তার নীতিবোধ, তার বিবেক—সবকিছু নিয়ে এতবড় একটা ফাঁকি সে টেনেচলবে কেমন করে? এমন, তাদের জন্য যতটা নয়, তার নিজের জন্য-ই তার যাওয়া দরকার।

এই আত্মজিজ্ঞাসার কশাঘাত-ই তাকে সন্ধ্যার পর নিয়ে যায় কালীঘাটের দিকে সেই বাড়িখানার খোঁজে। গাড়িখানা যখন

বড়রাস্তায় থামায়, তখন অসীমের হাত দু'খানা ঘেমে ঠাণ্ডা হয়েছে। একুশ বাই তিন বাই এক, বাড়িখানা গলির মধ্যে হবে বলেই মনে হচ্ছে। অসীম গলিতে ঢোকে।

পুরোন ঢঙের গলি। ট্রাম-বাসের শব্দে মুখর রসা রোডের এত কাছে, তবু নিস্তরঙ্গ বিসর্পিল এক অজানা জায়গা। চুনবালি-খসা দেওয়ালগুলোতে সে কি নম্বর পড়তে পারবে? দেখে এগোয় অসীম। একটা লাইব্রেরি ঘরের সামনে বারান্দায় বসে ক'জন ছোকরা গল্পে মশগুল। তাদেরই সে জিজ্ঞাসা করে—একুশ বাই তিন বাই এক বাড়িটা কোথায়?

—কার বাড়ি?

—বিনয়কুমার গাঙ্গুলী।

নামটা বলতে অসীমের গলাটা কেঁপে যায়। একজন বলে—আরো আগে। ল্যাম্পপোস্টটার পাশে ডানহাতি একতলা বাড়ি। সামনে রোয়াক।

ছেলেটি তখনি নিজেদের মধ্যে চাপাগলায় বলে—হ্যাঁ রে সেই! দেখিস্‌নি কোর্টে?

—তুই রাখালদা-কে ডাক।

—তখন বাবুর ঢং কত! মাথা তুলে তাকাতে পারছিলো না!

—পাঁচশো টাকা নাকি ঠেকিয়ে দিয়েছে?

—রাখালদা বললে ফেরৎ দিয়েছে পণ্টুর মা।

—আজ ভদ্রলোককে শিক্ষা দিয়ে দিই। কি বল্‌?

—রাখালদাকে ডাক না।

অসীমের কানে কথাগুলো যায়নি। ল্যাম্পটার কাছাকাছি পৌঁছিয়ে সে ডানদিকে কোন্ বাড়িটা হতে পারে তাই ভাবছিলো। সহসা একটা বাড়ির আধখানা দরজা দিয়ে শোকের কান্নার গুঞ্জরণ

ছড়িয়ে পড়লো নিশুত গলিতে। আর বলতে হলো না, যে এই সেই বাড়ী।

—কোনদিন আরাম করলে না, সুখ চিনলে না! আর ভগবান তোমাকে কি এমন করেই মারলো গো? আমার বুক ফেটে যায়····

শুনতে শুনতে পাথর হয়ে গেল অসীম। আর তখনই তার কাঁধে পড়লো একখানা ভারী হাত। একটা মোটা গলা—মশায়, এদিকে একবার শুনবেন?

এ সেই ছেলেটি। যাকে অসীম দেখেছে কোর্টে, ছোট ছেলেটির সঙ্গে। এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছেলেটির চোখের ঘৃণা যেন অসীমকে পুড়িয়ে ফেলতে চায়। ছেলেটি বলে—পয়সা আছে, পুলিশ অফিসার মামা না মেসো আছে, খুন করে পার পেয়ে গেলেন! আবার বাড়ি বয়ে কি মজা দেখতে এসেছেন?

—আপনি বুঝতে পারছেন না—

—খুব বুঝছি! চমৎকার বুঝেছি। ভেবেছেন চাঁদির জুতোর জোরে সব জায়গায় পার পাবেন, কেমন? তাই পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিলেন, না?

—আমি সেই কথাই বলতে এসেছিলাম আজ···ক্ষমা চাইতে····
ওঃ!···

কথাটা আর শেষ হয় না। অসীমের মুখের ওপর এসে পড়ে বলিষ্ঠ একটা ঘুসি! এতদিন ধরে মনে মনে যে বিক্ষোভ আর ক্রোধ জমে উঠেছে, তাই ছিটকে ছিটকে বেরোয়—ক্ষমা চাইতে এসেছো! অভদ্র, ছোটলোক, লজ্জা করে না তোমার?

অসীম প্রতিবাদ না করে কেন যে এমন করে মার খায়, নিজেই যেন বোঝে না। কয়েক পশলা কিল-চড়-ঘুসির পর একটা ধাক্কায় অসীম গিয়ে পড়ে ল্যাম্পপোস্টটার ওপর। কপালটায় বাড়ি খায়। চওড়া সুন্দর কপালটা দিয়ে নামে রক্তের ধারা।

আর তীব্র একটা তিরস্কারের সুর ফেটে পড়ে—রাখালদা!

সম্বৃত হয় ছেলেগুলি। অসীমের শাস্তিদাতা সেই ছেলেটি এগিয়ে আসে। বলে—সুজাতা!

মেয়েটি বলে—ওঁকে আসতে দাও। যা বলবার আমিই বলবো। আপনি উঠে আসুন।

এই পরিস্থিতি হবে জেনেশুনেই এসেছে অসীম। তবু, এখন আর উঠে যেতে পারে না সে। এই তিনটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে, আর ঐ চৌকাঠটার সামনে দাঁড়াবে ঐ পরিবারটির সামনে—এ যেন কিছুতেই হতে পারে না। আবার এ-ও জানে অসীম, যে তাকে যেতেই হবে ওখানে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা যা বলে তা শুনতে-ই হবে। কেননা, এখন আর অসীম পেছিয়ে যেতে পারবেনা।

একটা মুহূর্ত্ত-ও আণবিক সব টুকরোয় ছড়িয়ে পড়ে এক একটা বড় বড় সময় হয়ে দাঁড়ায়। অসীম একবার পিছনের দিকে চায়—আশ্চর্য এই, যে ছেলেগুলির প্রতি তবু সে কৃতজ্ঞ বোধ করে। এই যে কপাল থেকে রক্ত পড়ছে, তার চটচটে অনুভূতির জন্য। কাঁধে বোধ হয় ছড়ে-ও গেছে খানিকটা, সেজন্য। মনটার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে-ও যে যন্ত্রণা হচ্ছে—সেজন্য।

—উঠে আসুন আপনি!

আবার ডাকে মেয়েটি।

আর উপায় নেই। অসীম এবার সত্যিই উঠে আসে রোয়াকে। ছেলেগুলি ভীড় করে আছে রাস্তায়। এ পাশ ও পাশের বাড়ীর-ও জানলা খুলে গিয়েছে। সবাই দেখছে অসীমকে। অসীমের মনে হয়, যেন সবগুলি চোখ তাকে বিঁধছে, মজা দেখছে।

একবার চোরাবালিতে পা দিলে যেমন ক্রমেই অতলে তলিয়ে যেতে হয়, অসীমের তেমনই অবস্থা। কপালটা হাতে চেপে ধরে

দাঁড়ায় অসীম ঘরের দরজায়। রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে তাকায়। দেখে নিরাভরণ একখানি ঘর। তক্তাপোশে বইখাতা ছড়ানো। সেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে ভয়ার্ত ভাবে। দেখে সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে বিধবা মা। একহাতে ছেলেকে টেনে নিয়েছেন, আর চোখে ফুটে উঠেছে ঘৃণার কঠিন ভাব। বছর বিশ বাইশের দীর্ঘাঙ্গী একটি মেয়ে। ডাগর চোখের আদলে ভাই-বোনকে চিনতে ভুল হয় না। রুক্ষ কেশের বেণী সামনে টানা, ডুরেশাড়ির আঁচল গায়ে জড়ান মেয়েটি তার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে—কেন এসেছেন আপনি ?

—আমি···আমি···

অসীমের আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত ভিজে উঠেছে। হত্যাকারী তবু একখানা সুশ্রী তরুণ মুখ, বেদনাহত অপরাধীর দৃষ্টি—মা-র মনে তবুও মায়াও লাগে, মেয়ের কণ্ঠে এতটুকু দাক্ষিণ্য নেই। কঠোর তিরস্কারে সুজাতা বলে—আপনাদের সে টাকা আমরা ফেরৎ দিয়েছি····আপনাকে আমরা হত্যাকারী মনে করি····আপনি তার পরেও এসেছেন···

—আমার একটা কথা আপনারা শুনুন···সে টাকা তো কোর্টের decision····আমি তো সে টাকা দিতে চাইনি···আমাকে আপনারা বলুন···

—কোন টাকাই নয়! আপনাদের দয়ার দান কোন টাকাই আমরা নিতে পারি না····আমার বাবা···

সব চোখের জল যেন জ্বালা হয়ে জ্বলছে সুজাতার চোখে। সুজাতা বলে—আমার বাবার তাতে অসম্মান হবে।

কাছে এসে মুখ তুলে বলে—চলে যান আপনি। আর কখনো আসবেন না! কোনদিন না!

মুখ ফিরিয়ে নেমে আসে অসীম। আশে পাশের বাড়ীতে

লোক জমে উঠেছে। সকলে দেখছে তাকে। রাখাল আর সেই সব ছেলেরা একপাশে সরে দাঁড়ায়। অসীম কপালে হাতচাপা দিয়ে প্রায় ছুটে চলে যায় গলি ধরে। গাড়িতে গিয়ে ওঠে। স্টার্ট দেয়। তারপর বড় রাস্তা ধরে জোর চালিয়ে রেড রোড, খিদিরপুর, গঙ্গার ধার। আহত শ্বাপদ যেমন আঁধারে চলে যেতে চায়, তেমনই, আহত এক পশুর মতোই নির্জনতার প্রয়োজন অনুভব করছে অসীম। এমনি আঁধারই এসে ঢেকে ফেলুক তাকে। তার অপরিসীম লজ্জা, তার কলঙ্ক, সব ঢেকে শাস্তি দিক তাকে।

গড়ের মাঠের পাশে গাড়ী রেখে নেমে পড়ে অসীম। বসে থাকে একলা মাঠে। সমস্ত অনুভূতি যেন একবার মরে যায়—কিছু থাকে না মনে—শুধু একটা শূন্যতা। আবার হঠাৎ সমস্ত মনটা হাজারটা আহত অনুভূতির জ্বালায় জ্বলে ওঠে। শ্রান্ত দেহ, আর দেহের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতবিক্ষত মন নিয়ে অসীম ফিরলো বাড়ি। ফিরলো পা টিপে টিপে। ছোট বাতি জ্বেলে নিজের কপালে নিজেই ওষুধ আর প্লাস্টার লাগলো। তারপর জামা-কাপড় না বদলেই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো বালিশে। আঁধারে জ্বলতে লাগলো সিগারেট, আর কুণ্ডলী খেতে লাগলো এলোমেলো সব চিন্তা। চোখে ঘুম নেই, বুকে পাষাণের গুরুভার। অনিচ্ছাকৃত এক অপরাধ, দুরপনেয় কলঙ্ক লেপে দিয়েছে তার নামে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, হত্যা করেছে সে!

কেমন করে এই পাষাণটা নামাতে পারে সে বুক থেকে? দেহের আঘাতের চেয়ে মনটা যে অনেক বেশি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তা তা কেউ জানছে না! কোথায় কোন্ দরদী বন্ধু কোন্ সান্ত্বনা দেবার মানুষ আছে, যে তাকে আশ্বাস দিতে পারে।

নিদ্রা বুঝি সকল দুঃখ-হর। তাই অসীমের চোখেও ঘুম নামে। তবে সে ভোররাতের দিকে। ক্লান্ত চোখ তবু স্বপ্ন দেখে। দুটি

বড় বড় অশ্রুসজল দীপ্ত চোখ, আর তীব্র ভর্ৎসনা—চলে যান আপনি! কে চায় আপনাদের দয়ার দান!

ওদিকে অসীম চলে গেলে পরে সুজাতা এমনই দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

চোখ দিয়ে জল পড়ে ধারা বয়ে যায়। নিজেকে যে সে শতবার অপরাধী করেছে। তার জন্যেই যে তার বাবার এরকম শোচনীয় মৃত্যু হলো, তা কি সে জানে না? অবস্থা যেমনই হোক, বাবা কাজ করে, ছাত্র পড়িয়ে তাকে কলেজে পড়িয়েছিলেন, বি. এটাও পাস করে ফেলতো সে নিশ্চয়ই। পড়ছিলো ফোর্থ ইয়ারে। গরীব ঘরের মেয়ে। সুজাতার নিজের জেদ ছিলো, এর পরে আর তোমাকে চেষ্টা করে বিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজের পায়ে ঠিকই দাঁড়াব। তখন তোমার দায় হয়ে নয়, ভার হয়ে নয়, পাশে এসে দাঁড়াব। তুমি যে বলো, ছেলে মেয়েতে তফাৎ নেই। সে শুধু দৃষ্টি ভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা। তবে সে কি শুধুই মুখের কথা? কিন্তু বিনয়বাবুর ইদানীং বড্ড দুশ্চিন্তা হয়েছিলো, যে সুজাতার বিয়ে দিতেই হবে।

—বিয়ে করতেই হবে, তার কি মানে আছে বাবা? সুজাতা বলতো।

—হ্যাঁ মা! মানে আছে বইকি। বিয়ে করো, সংসার করো—আবার কাজও করো। আজকাল লেখাপড়া জানা কোন মেয়েটা বলো, যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলেই বাড়িতে বসে আছে? সকলকেই তো দেখি কোথাও না কোথাও কাজ করতে। তুমিও তাই করবে। এদেশে ওদেশে সর্বত্র করছে মেয়েরা।

বিনয়বাবু ইদানীং ব্লাডপ্রেসারটা যেমন বেড়েছিল, তেমনই মাথায় ঢুকেছিলো মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তা। সর্বদা স্ত্রীকে বলতেন

—মেয়ে আমার যেমন বুদ্ধিতে বিবেচনায়—সকল দিকে—তেমনি একটি ছেলে পাই তো বেঁচে যাই!

—তুমি যেমন চাও, তেমন কোন ভাল ছেলে, সে বড্ড খরচের ব্যাপার!

—তা খরচ হবে বলে ভাল ছেলে খুঁজবো না? লাইফ ইন্‌সিওরের দু'হাজার টাকা আর পোস্ট-অফিসের দু'হাজার—এর থেকে মেয়েরও বিয়ে দোব, আর পল্টুর জন্যেও রাখব। উপায় কি? নয় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করবো।

বড্ড চিন্তা ছিলো মাথায়। নিজেই ঘুরে ঘুরে খুঁজতেন। সেদিন শরীটা খুব খারাপ। সকাল থেকেই বলছিলেন—শুয়ে থাকতে পারলেই ভালো হয়। যেতে যেন ইচ্ছে করছে না।

স্ত্রী বলেছিলেন—না গেলে হয় না?

—না। আজ আমাদের একটা দরকারী হিসেব দাখিলের দিন।

—তবে কিন্তু অফিসের পরই চলে এসো বাবা।

—তোর রাঙাপিসীমার বাড়ী একবার ঘুরে আসব ভেবেছিলাম।

—শরীর ভাল না লাগলে যেওনা কিন্তু।

—আচ্ছা, তবে নয় ফিরে আসবো।

—আর শোন।

বলে কাছে এসেছিলো সুজাতা। বাবার হাতে হাত রেখে বলেছিলো।

—অফিসে কার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়েছিলে? মা-কে যে বলছিলে রাতে? এই যে—মীরাদের বাড়ী থেকে টাকাটা দিয়ে গেল সকালে টিউশনীর। তুমি এ দশটা টাকা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিও।

বাবা খানিকটা কৃতজ্ঞ হয়ে-ই নিয়েছিলেন। সুজাতা সামান্য-ই

পায়। তবু দুজনে এইধরণের জোড়াতালির ব্যবস্থা প্রায়ই চলে। এসব কথা সব সময় সুজাতার মা-ও জানতে পারেন না।

বাবা চলে গেলে পরে সুজাতা দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেয়েছিলো। আধবুড়ো রোগা মানুষটি কেমন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন—বাবাকে পেছন থেকে এমনভাবে চলতে দেখলে সুজাতার কেন যেন বড় কষ্ট হয়। বাবার মুখেচোখে সবসময় কেমন একটা ভাগ্যহত হেরে যাওয়া ভাব। মা কত সময় অক্ষমতার জন্য বাবাকে কথা শোনান। সে সব সময় সুজাতার মনে হয়েছে, যে শুধু পল্টু নয়, তার বাবা ও সবিশেষ অসহায়—আর তাঁকে-ও রক্ষা করবার, বুক দিয়ে আগলে রাখবার প্রয়োজন আছে। সুজাতার মনে এই যে মমতাবোধ, তার কারণ বোধহয়—ছোটবেলা থেকে অনেক দুঃখের স্মৃতি তার মনে আছে। বিনয়বাবুর মতো এমন করে ভাগ্যের হাতে মার খেতে সে কাউকে দেখেনি। যে সব লোকগুলো প্রতিবাদ না করে মার খায় তাদের ওপরে-ই ভাগ্য হয়তো বিশেষ করে অকরুণ হয়।

বিনয়বাবুর বাবা মারা যান বড়ছেলের ছাত্রাবস্থায়। বি. এ. পড়বার সময়-ই ঘাড়ে এসে পড়লো সংসার। সে সময় তাঁর এক পিসতুতো ভাই-এর বদান্যতায় তিনি বি. এ. টা দিতে পেরেছিলেন, এবং পাশ-ও করেছিলেন।

সে কৃতজ্ঞতা বিনয়বাবু কোনদিন-ও ভুলতে পারেননি। সুজাতার মনে আছে এই সব কৃতী ও ধনী আত্মীয় স্বজনের প্রতি তার বাবার কি রকম ভক্তি ছিল। তিনি মনে করতেন, এঁদের নিশ্চয় এমন কোন সদ্‌গুণ ও সুকৃতি আছে, যা তাঁর নিজের নেই। এবং এঁরা সকলেই যে কতো ভালো, কত উঁচুদরের মানুষ, সে কথা বিনয়বাবু সুজাতাকে কতবার কতরকমে শুনিয়েছেন।

ছুটির দিনে বিনয়বাব বলতেন

—চল, আজকে তোকে তোর স্থরেন কাকার বাড়ীতে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

স্থজাতার মা বরঞ্চ মাঝে মাঝে রেগে যেতেন। বলতেন—তিনি এই রাস্তা দিয়ে তাঁর মেয়ের শ্বশুর বাড়ী যান কই, আমাদের এখানে তো ভুলে-ও পা দেন না। তুমি বারবার যাও কেন?

—আহা বোঝনা কেন, তারা কতকাজের মানুষ।

—তুমি কাজের মানুষ নও?

—তার সঙ্গে আমার তুলনা?

বলে এমনভাবে হাসতেন বিনয়বাবু, যেন বার্নকোম্পানীর পারচেজিং অফিসার স্থরেন মুখুজ্যের সঙ্গে বিনয়বাবুর তুলনা যদি কারো মনে আসে, তবে সে জন পাগল।

যার টাকা আছে, তারই সমস্ত কাজ ও কথার দাম আছে, এবং তাঁর মতো সাধারণ মানুষের কোন কিছুর-ই দাম থাকতে পারে না—এ বিষয়ে বিনয়বাবুর মনে কোন সংশয় ছিলনা। ছুনিয়াতে তাঁর মতো মানুষের যে সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই, এ সত্য তিনি পিতৃপুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্থান পেয়েছিলেন—এবং এই সত্যই তিনি ছেলেমেয়েকে দিয়ে যাবেন, এ-ও তিনি জানতেন। জীবন সম্পর্কে যে সত্য-ই জানুননা কেন তিনি যাবার সময়ে যে কোন কিছু-ই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না—সে বিষয়ে-ও তাঁর কোন সংশয় ছিল না। বরঞ্চ সে বিষয়ে তিনি বেশ জ্ঞানী-ই ছিলেন। বাসাংসি জীর্ণানি—ইত্যাদি তিনি ভাল করে-ই জানতেন। ইহকালটা যাদের একেবারে-ই ফাঁকি, তারা-ই পরকাল সম্পর্কে এমন তারিয়ে তারিয়ে ভাবতে পারে এবং ভাবে। পরকাল, পরলোক, এবং দৈবী শক্তির প্রয়োজন তাদের-ই হয়। বিনয়বাবুও জানতেন, তিনি নিয়ে যেতে পারবেন না কিছুই—এবং শেষকালে ছেলেকে এই শিখিয়ে যাবেন, যে ছুনিয়ার কাছে তোমার চাইবার

কিছু নেই। যা পাবে তা খুশীমনে নিতে হবে। এবং তোমার জন্যেই সেই নীতি—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে—তুমি কোন ফল প্রত্যাশা করবে না। অন্যমানুষকে জীবনভোর দেখবে, অনেক কম কাজ করে অনেক বেশি পাচ্ছে—তা দেখে-ও বিচলিত হবে না।

সুজাতার মনে আছে সেই সব বড়মানুষের বাড়ীতে সে কিরকম ব্যবহার পেয়েছে। তাকে আর বিনয়বাবুকে যেতে হয়েছে বাস বদল করে করে, হেঁটে—যেতে যেতে সুজাতার পায়ের গোড়ালিতে জুতোর ঘসায় ছালচামড়া কেটে গেছে।

সেখানে পৌঁছে এক একদিন তারা এক একরকম ব্যবহার পেয়েছে। কোনদিন দেখা গিয়েছে বিনয়বাবুর সুরেনদা, বাইরের ঘরে বহুজন পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। বিনয়বাবুকে প্রথমটা নজরে-ই পড়েনি তাঁর। কিছুক্ষণ বাদে বলেছেন—কে, ও, বিনয়? তা কি মনে করে, এঁ্যা? কি মনে করে?

বিনয়বাবু হেসে বলেছেন

—এই এলাম আর কি! তোমরা সব কেমন আছ, বৌঠান কেমন আছেন!

—অ!

বলে আবার নিজের কথায় ফিরে গিয়েছেন সুরেনবাবু। পাঁচসাত মিনিট বাদে আবার তাঁর খেয়াল হয়েছে, যে সামনের শূন্যটা একেবারে শূন্য নয়, দৃশ্যগ্রাহ্য কিছু সেখানে আছে। তিনি বলেছেন

—কি, ভেতরে যাবে? যাও, যাও—এখন আবার সব কাজের সময়!

রবিবারের সকালে-ও বড়লোকের বাড়ীর অন্দর-মহলে মেয়েরা কত ব্যস্ত থাকতে পারে, দেখে দেখে অবাক হয়েছে সুজাতা। তাদের বাড়ীতে তার মা-ও ব্যস্ত থাকেন রবিবারে। রবিবারে

সুজাতা ঘরদোরের ঝুল ঝাড়ে, ঝাড়ী গোছায়। মা সকালবেলা (মাসের প্রথম দিক হ'লে), জলখাবারের জন্য লুচি পরোটা করেন। তারপর তার, পল্টুর, বাবার—সব বেরুবার জামাকাপড় সোডায় সেদ্ধ করে টিন বোঝাই কাচেন। কাচতে কাচতে মা-র মুখটা লাল হয়ে যায়, বুকটা হাঁপাতে থাকে। সুজাতা তখন রান্না দেখে। রবিবার বাবা বেলা করে বাজারে যান। একটু বেলা করে স্নান করেন। খাওয়দাওয়া হতে দেড়টা দুটো বেজে যায়। এই তাদের রবিবারের ব্যবস্থা।

কিন্তু এই বাড়ীতে রবিবারটা সম্পূর্ণ অন্য রকম কাজকর্ম নিয়ে আসে। সুরেনকাকার বিবাহিত মেয়েজামাই রবিবারে খেতে আসে। সেজন্য সুজাতার কাকীমা গলদা চিংড়ি, মাংস আর রাবড়ি-র ফর্দ লিখে বাজারের জন্যে পনেরোকুড়ি টাকা দেন বেকার ভাগ্নে-র হাতে। তাঁর অন্যমেয়েরা সেজেগুজে গানের স্কুলে বা নাচের ক্লাসে চলে যায়। ছেলেরা সকালের শো-তে সিনেমা দেখতে যায়। সুরেনকাকা নিজে হুইল নিয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে গাড়ী চড়ে মাছ ধরতে যান কলকাতার বাইরে। সুরেনবাবুর স্ত্রী এই সব কিছুর ব্যবস্থা করতে ছুটোছুটি করেন। তাঁর দামীশাড়ীর আঁচল কাদায় জলে মেখে যায়—তরকারী কুটতে বসলে। তাঁর ঝি ধোপাকে ধবধবে ফর্সা সব জামাকাপড় আবার ধুতে দেয়; সুজাতা অনেক সময় ভেবেছে, এত পরিষ্কার জামাকাপড়, এর আবার ধোপা কি কাচবে। নাচগানের স্কুলে বেরুতে বেরুতে মেয়েরা বলে যায়

—আমার কাপড়টায় গরমজল দিওনা, শুধু লাক্স দিও। রিবন গুলো ইস্ত্রী ক'রে দিও।

এইসব কাজের ভিড়ে-ও সুরেনের স্ত্রী কথা বলেছেন সুজাতাদের সঙ্গে। বেশ পিঠ চাপড়ানো সব কথা। বলেছেন

—আর এমন করে ভাড়াবাড়ীতে থাকবেন না—একটা বাড়ী তৈরী করুন। একটা নিজের বাড়ী নইলে কি হয়?

—তা তো বটেই।

বলে কথা হারিয়ে ফেলেছেন বিনয়বাবু। কোনদিন সুরেনের স্ত্রীর মনে হয়েছে সুজাতার কথা। তিনি মিষ্টি আনিয়ে দিয়েছেন। কোনদিন বা, এমনি করে অনেকক্ষণ বসে উঠে পড়বার সময়ে বিনয়বাবুর দিকে চেয়ে তিনি বলেছেন

—সে কি, চা-ও খেলেন না?

সুজাতা যখন বড় হয়েছে, তখন থেকে সে আর বাবার সঙ্গে এ সব জায়গায় যায়নি। বাবা যে শিখিয়েছেন—এঁদের ভক্তি কর—মনের ভেতর থেকে শ্রদ্ধার তাগিদ সে পায় নি। এঁদের শ্রদ্ধা করতে তার অসুবিধে হয়েছে।

সুজাতার ভেতরকার সত্তাটার আত্মসম্মান বোধ দেখে, তার বাবা, সুজাতার মনে হয়, তাকে-ও শ্রদ্ধাই করেছেন। কেননা ভয়ভক্তি ছাড়া অন্য অনুভূতি তাঁর মনে সহজে আসেনা।

সুজাতা ম্যাট্রিক ক্লাস থেকে নিজে টিউশনী করে পড়েছে। তার বুদ্ধি বিবেচনা দেখে বিনয়বাবু কত সময় যে আশ্বস্ত হয়েছেন ও শান্তি পেয়েছেন, তা জেনেছে সুজাতা। তার একটা কথাই মনে হয়েছে, সে দাঁড়াবে-ই বাবার পাশে। তাঁর সাহায্য হয়ে, সহায় হয়ে।

কিছুই আর হলো কই? বিনয়বাবু যখন অফিসে যাচ্ছিলেন, সুজাতা তখন দাঁড়িয়ে দেখছিলো বাবাকে। তখন কি সে জানে, যে আর দেখতে পাবে না বাবাকে? সেই যে চলে গেলেন বিনয়বাবু, সে কি জানতো, যে তার পরে আর কেউ বাবাকে জীবিত দেখতে পাবে না?

সেদিনের সেই সর্বনাশা সন্ধ্যাটা। সন্ধ্যাটা যেন আর রাতের

দিকে এগোতে চাইছিল না। সন্ধ্যাটা যেন গুঁড়ি মেরে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে যাচ্ছিলো রাতের দিকে। পাছে তাড়াতাড়ি সময়টা কাটলে সুজাতাদের কিছুটা স্বস্তি হয়।

তারপর রাখাল এলো, সেই অফিসারকে নিয়ে। সুজাতাকে কিরকম যান্ত্রিক গলায় বলে চলেছিলেন ভদ্রলোক—আপনার বাবার এই ডায়েরী? কোথায় কাজ করতেন? তাঁর গায়ে কি সূতির কোট আর সার্ট ছিলো? আপনাকে একবার হাঁসপাতালে যেতে হবে। আপনার কোন বড়ভাই নেই?

তারপর সবটাই দুঃস্বপ্ন। অথচ স্বপ্ন নয়, সত্যি। সত্যি। মেডিক্যাল কলেজে যাওয়া। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে একটা সাদা পর্দা ঢাকা খাটের সামনে দাঁড়ানো। লাল কম্বল তুলে ধরা আর সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কটা যেন দশ আঙুলে চেপে ধরলো সুজাতার বুক।

আজও যে সে ছবি তার চোখে ভাসে। তার বাবার সেই রেখাঙ্কিত শীর্ণ অসহায় মুখ, আর রক্তাক্ত অবশিষ্ট।

ভাবে, আর যন্ত্রণায়, দুঃখে, বুকখানা ফেটে যায় সুজাতার।

অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য বেকসুর খালাস…এই কি একটা রায় হলো? একজনের অসাবধানতা যদি আর একটা পরিবারকে জীয়ন্তেই মেরে ফেলে, অসহায় করে ফেলে, পরিবারের প্রধান মানুষটিকে মেরে ফেলে, তবে কি তার কোনো শাস্তিবিধান হবে না?

তার মা বলছিলেন—এত বয়স? অথচ এরই হাতে ..

হ্যাঁ সে কথা সত্য! অপরাধীর বয়স কম। সে হয়তো অনুতপ্তও। আর যেচে দেখা করতে এসেছে যখন, সে হয়তো মূর্খও।

তবু তার জন্যে সুজাতার বুকে এতটুকু অনুকম্পা নেই। পাঁচশো টাকা ফেরৎ দিয়েছে বলে সে দেখা করতে এসেছে!

সুজাতা তার দয়ার দান চায় না। ক্ষতিপূরণ? পুত্রকন্যা পিতাকে ফিরে পাবে না। বিধবা ফিরে পাবেন না তাঁর স্বামীকে। তবে এ কিসের ক্ষতিপূরণ?

॥ ছয় ॥

নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি অসীম নিজের কাছ থেকে। বাড়ীতে ফিরতে তার অনেক রাত হয়েছিলো, ঘুম ভাঙতে হয়েছিল বেলা। সুরেশ সকালবেলাই ছেলেকে দেখতে এলেন। দেখেই বুঝলেন গোলমাল হয়েছে কোথাও, আর কেমন করে যেন বুঝলেন, যে এর সঙ্গে কালকের সে চিঠি ফেরৎ দেবার কোন যোগাযোগ আছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কোনরকমে মারধোর খেয়েছে কিনা অসীম, সে প্রশ্ন অনেকবার তাঁর মুখে এলে-ও উচ্চারণ করেননি। পাছে অসীম লজ্জা পায়। নিজেই আগবাড়িয়ে বলেছেন,

—সাবধান হয়ে গাড়ী চালাও না—কি যে কর আজকাল! থাক্, ব্যথা কেমন? পেনিসিলিন নিয়ে নেবে ছুটো?

অসীম বলেছে—না, তেমন কিছু নয়।

বাবার দিকে চাইতে তার লজ্জা হয়েছে। তবে ক্ষতবিক্ষত মুখ, ক্লান্ত চেহারা, চোখের নীচে কালি, বাবার কাছ থেকে নিজেকে সে লুকোতে পারেনি। পাশে বসে সুরেশ শুশ্রূষা করেছেন। ওভালটীন খাইয়েছেন। বলেছেন—বলো। বলো কি হয়েছে? গিয়েছিলে সেখানে, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তারপর?

—তারা আমার কথা শুনতেই চায় না। তাদের চোখে আমি একজন অপরাধী, ব্যাস্। আর কোন কথা নেই।

—টাকাটা ফেরৎ দিলো কে? মা?

—না। মেয়ে।

—অবস্থা কি রকম ?

—খুব খারাপ, বাবা।

—তোমার সঙ্গে এই যে, মানে ঝগড়াটা হলো···

—না, না, সেখানে কিছু হয়নি···আর ওটা সামান্য একটা ব্যাপার আমারই অসাবধানতা।

—ও। ওটাই একটা মুশকিল হলো দেখছি! একটা কোন ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যেতো। তবে এখন থাক।

—আমারও তাই মনে হয়।

অসীমের চোখের নিচের কালি মেলাতে চায় না। একটি পরিবারের ক্ষমা পায়নি সে, সেই মনস্তাপে রাতগুলো তার বিনিদ্র হয়ে যায়।

মনের তলায় যে চিন্তাগুলো মাথাকুটে মরে, তাদের নিয়ে আর পারে না অসীম। পরিষ্কার বুঝতে পারে সে—তাকে আবার যেতে-ই হবে। যেতে হবে—ক্ষমা চাইতে হবে, আর ক্ষমা পেতে হবে। নইলে নিজের কাছ থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

সমস্ত দিন এবং রাতে যদি একই চিন্তা হৃদয় মন জুড়ে থাকে, তবে সে কি করবে ?

যেতে তাকে হবেই তবু যেন সাহস পায় না। সাহস পায় না এইভেবে, যে আবার যদি তারা তিনজন, মা, মেয়ে আর ছেলে, ঘৃণা ভরা চোখ নিয়ে তাকায়—তবে কি অসীম সে তিরস্কার সহ্য করতে পারবে ?

এমনি ভাবনায় কিছুদিন কেটে যায়। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অসীম।

এবার তাই রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে নয়। সোজাসুজি চলে যায় অসীম এক রবিবারের বিকেলে।

বাচ্চা ছেলেটি রঙীন কাগজ দিয়ে ঘুড়ি জুড়ছিলো। সে অসীমকে দেখে চেয়ে থাকে। অসীম একটু হাসে। বলে—তোমার মাকে একটু ডাকবে ভাই?

ছেলেটি বিদ্যুতের মতো পালিয়ে যায় ভেতরে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে মা আসেন। অসীমকে দেখে দাঁড়িয়ে যান। মুখখানা রক্তশূন্য হয়ে যায়। বলেন—তুমি? আবার? কেন?

অসীম বলে—আজকেও তাড়িয়ে দেবেন? দিন! মারতে চান মারুন! কিন্তু ক'টা কথা আমি বলবোই। না বলে ছাড়বো না, আপনাকেও শুনতে হবে।

ছেলেটি এসে দাঁড়িয়েছে মা-র পাশে। একহাত মুঠো করা। চোখে বিদ্রোহের ভাব। অসীম বলে—বসুন।

—তুমি বলো।

—বসুন, তবে তো বলবো?

নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যেন পলটুর মা-র চোখ গিয়ে পড়ে ছেলেটির কপালে। সেদিনের কাটার দাগটা আজও ফুটে আছে ফর্সা কপালে। কেমন কোঁকড়া চুল, কেমন সুশ্রী সরল চেহারা।

অসীম আবার সকরুণ মিনতিতে বলে—বসবেন না? তবে কি আমি আজও চলে যাব?

মা বসেন চৌকির এককোণে। অসীমকেও সেই চৌকিরই অন্যকোণে বসতে হয়। অসীম কিভাবে যে কথা শুরু করবে প্রথমটা যেন ভেবে পায় না। তারপর বলতে শুরু করে—আপনি বিশ্বাস করবেন আমার কথা, সে বিশ্বাসে বলছি না। তবু শুনুন. আমার সত্যিই দোষ ছিল না। যা হয়ে গেছে···তাতে আমার সজ্ঞানে অপরাধ কতটুকু বলুন?

—এসব কথা আমরা শুনেছি।

—আর অপরাধ, অজ্ঞানে হলেও যখন এতবড় পাপ করেছি··· আমাকে আপনি এতটুকু পাপ স্খালন করতে দেবেন না ?

—এসব কথা তুমি কেন বলছো আমাকে ?

—কেন বলছি—

অসীমের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, আবার ফ্যাকাশে হয়ে যায় বারবার। সে বলে চলে—আদালতে দাঁড়ালেও তো আত্মপক্ষ নিয়ে একটা দুটো কথা বলতে দিতো আমাকে? আপনি কেন এমন করছেন ? আমি আপনার এ ক্ষতিপূরণ করতে পারব না—এতটুকু ভরে দিতে পারব না। কিন্তু আমার হাত দিয়ে যদি জাগতিক এতটুকু সাহায্য হয়—সেটুকু থেকে কেন বঞ্চিত করছেন আমাকে ? কোর্ট আমাকে যে টাকা ধরে দিয়েছিলো···সে সামান্য টাকা দিয়ে আমি অপমান করতে চাইনি। সে টাকা ফেরৎ দিয়েছেন, বেশ করেছেন।

—তুমি কি বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে যদি না চান, বুকটাকে যদি পাথর করে রাখেন, তবে আলাদা কথা। কিন্তু আমার দিকে একবার চেয়ে দেখুন। আমার জীবন বিষিয়ে গিয়েছে, দিনে রাতে শান্তি নেই, বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে···

অসীমের গলা বন্ধ হয়ে আসে। এবার মা বাধা দেন—আর বোল না।

মাথা নিচু করে থাকে অসীম। টপটপ করে জল পড়ে পলটুর মা-র চোখ থেকে। পলটুও কাঁদোকাঁদো হয়ে যায়।

গলা পরিষ্কার করে অসীম বলে—এই ছেলে, এর সামনে জীবন পড়ে রয়েছে। যা হয়ে গিয়েছে, তা কোনদিনও ফিরে আসবে না। তাই বলে এই শিশুর জীবনটা নষ্ট করে কি হবে বলুন ?

—ওর দিদি দিবারাত্রি কাজের চেষ্টা করছে। যা হয় একটা হবেই···সহায় নেই, সম্বল নেই, একেবারে অকূল পাথারে ভাসিয়ে···

—তাই, আমাকে এতটুকু সুযোগ দিন। অন্ততঃ এই ছেলেটির মুখ চেয়ে আমার ওপর এতটুকু দয়া করুন।

মা কোন কথা বলেন না। চোখের জল মুছতে আঁচল তুলে নেন।

অসীম এবার খসখস করে চেক লেখে একটা। পলটুকে ডাকে। যায় না পলটু। আবার ডাকে অসীম। এবার পলটু এক পা এগোয়। তার হাতে চেকটা গুঁজে দেয় অসীম। তারপর মা কিছু বোঝবার আগেই নীচু হয়ে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে আসে। কোনদিকে না চেয়ে নেমে যায় সিঁড়ি ক'খানা বেয়ে। তারপর মাথা নীচু করে চলতে চলতে সামনের পানের দোকানটায় দাঁড়ায়। পলটুর মা দেখতে পান, ছেলেটি কপাল থেকে চুল সরিয়ে কপাল ঘাড় মুছলো। তারপর লেমনেড একটা কিনে ঢকঢক করে খায়। বুকের ভেতরে কেমন একটা অনুভূতি—যেন ঘা দেয় পলটুর মা-র। তেষ্টা পেয়েছিলো বোধহয়। তেষ্টা পেয়ে ঘেমে গিয়েছিলো গরমে। তা তো হবেই। ঘরখানা যে পশ্চিমের রোদে গরম। জল একগ্লাস দিলেও পারতেন। তবে সে চায়নি। ভরসা পায়নি হয়তো। কোন মুখে জল চাইবে। যাবার সময়ে পায়ে হাত দিয়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে গেল। অপরাধীর হাতের স্পর্শ।

পা দু'খানায় তাঁর জ্বালা করা উচিত ছিলো। কিন্তু কোথায়?— মা চোখ নীচু করে দেখেন, তাঁরই চোখের জল তাঁরই পায়ে পড়লো। যেন ক্ষমা করলো সেই ক্ষমালোভী ঘর্মাক্ত হাত দু'খানার ছোঁয়াকে।

আর ছেলেটিকে দেখা যায় না। সহসা মা-র হলো, একটি শিশু তাঁর কোল খালি করে চলে গিয়েছিলো পঁচিশ বছর আগে। সুজাতার সে ছিলো দাদা। আজ যদি সেই ছেলেটি থাকতো, তবে ঐ ছেলেটির বয়সীই হতো হয়তো।

চেকটা কত টাকার? দুই হাজার টাকা। দু-ই-হা-জা-র! অনেক টাকা। তাঁর স্বামীর সারা জীবনের সঞ্চয়।

টাকাটাই সব নয়। মানুষটার কথাও মনে হয়। মনে হয়, আর সেই হতভাগ্য অপরাধীর জন্য চোখে তপ্ত অশ্রুর দু'চার ফোঁটা ঝরে পড়ে।

কোন্ ঈশ্বর রচনা করেছেন মাতৃহৃদয়? যে অপরাধীকে দেখেও ব্যথিত হয়? যে মানুষ একটা জীবন ব্যর্থ করে দিলো, তার দুঃখ-ও স্পর্শ করে মাতৃহৃদয়কে। এ কেমন বিস্ময়?

দুপুরে কোনমতে দুটি ভাত খেয়ে সুজাতা রাখালের সঙ্গে গিয়েছিলো টালিগঞ্জে। তার বাবার অফিসারের বাড়ি। হাজরা বড় জবরদস্ত অফিসার। তার বাবা কোনদিন হাজরার ঘরে বসবার হুকুম পর্যন্ত পাননি। বাবা চাকুরিক্ষেত্রে বড্ড ভয় করে চলতেন। কেন করতেন, তাও বোঝে সুজাতা। চাকরি করবার বাইশ বছর বাদে মাইনে হয়েছিলো তিনশো দশ। ভয় না করলে তাঁর চলতোনা।

কিন্তু সুজাতাকে তো অমন ভয় করে করে চললে হবে না। তাকে যে সাহসী হতেই হবে। পড়াশোনা চালিয়ে যাবার আশা দুরাশা। আত্মীয় স্বজন কেউ সাহায্য করবেন? ভাবলে সুজাতার অতি দুঃখে হাসিই পায়। তার মা বলেছিলেন—একবার যা না তোর রাঙাকাকার কাছে। বল্‌না! এসেছিলেন তো খবর শুনে। আসেননি এমন তো নয়।

আপন কাকা নন। বাবার পিসতুতো ভাই। কোন্ এক মন্ত্রীর সেক্রেটারি। ইচ্ছে করলে যে সাহায্য করতে পারেন না তা নয়। হয়তো কাজকর্ম জোগাড় করে দিতেও পারেন। কিন্তু আন্তরিকতা যেখানে একবিন্দু নেই, সেখানে কোন্ ভরসায় গিয়ে দাঁড়াবে সুজাতা ?

বাবা মারা যাবার খবর পেয়ে এসেছিলেন সকলে ঠিকই। কিন্তু সে সমবেদনার ওপর ভরসা করা চলে কি ?

হাজরার জন্য বসে বসে পা যখন টাটিয়ে উঠেছে, হাজরা নীচে নামলেন ঘণ্টা তিনেক বাদে। ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের সময় নাকি এতটুকু ব্যাঘাত সইতে পারেন না।

সুজাতার কথাবার্তা শুনলেন। তারপর বললেন—বিনয় মানুষ তো ভালই ছিলো। তুমি তারই মেয়ে। কিন্তু বুঝলে তো? কতকগুলো কথা তোমায় বুঝতে হবে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো না থাকলে সরকারী অফিসে কাজ হয় না। ঐ এক্সচেঞ্জই সকলকে কাজের খোঁজ দেয়। আর তুমি বি. এ. পাস, না এম. এ.—

—বি. এ তো পাশ করতে পারিনি। সবে তো পড়ছি ফোর্থ ইয়ারে।

হাজরা যে ভাবে তাকান, তাতে মনে হয় এসে চরম ভুল করেছে সুজাতা। তখনই উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। বললেন—ম্যাট্রিক বা আই. এ.-কে তো লোয়ার ডিভিসনেও নিতে চায় না কেউ। বি. এ. যে প্রচুর পাওয়া যায়। তারও ক্লাস দেখে। আমি বলি—তুমি বরং বি. এ. টা পাশ করে নাও। তার সঙ্গে যদি টাইপটা শিখে নিতে পার তো আরো ভাল। সবচেয়ে আগে বরং তুমি এক্সচেঞ্জে নামটা লেখাও। তারপর দেখবোখ'ন। যদি আমার অফিসে নামটা ওঠে, ইণ্টারভিউ যাতে ভাল হাতে পড়ে সেটা দেখবো।

বেরিয়ে এসে সুজাতা বলেছিলো—দেখলে তো রাখালদা ?

—দেখলাম।

—কি হবে বল তো রাখালদা ?

—যা হয় একটা কিছু করতে হবেই।

রাখাল সোজাবুঝের মানুষ। সুজাতা বলে—তুমি বেশ সব কিছুই সোজা করে নাও। আমি যেন পারি না।

রাখাল বলে—জোর করে সোজা করি না। কেননা জটিল সমস্যাকে সহজ করে ফেলবার ক্ষমতা আছে একমাত্র টাকার। আমার টাকা নেই। তবে কি জানো সুজাতা ? আমি বুঝি, যে সমস্যার সমুখীন হতেই হবে, যার সমাধান করতেই হবে, সেটা একটা অসম্ভব কিছু এ কথা বার বার ভাবলে আমারই অসুবিধে হবে।

—তবু কিন্তু হলো না।

—কি হলো না ?

—আমার সমস্যার কোনো সমাধান।

—আহা, অযথা ভাবো কেন। এখনো টিউশনিটা চলছে, চলুক। আমি দেখতে থাকি এখানে সেখানে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি স্কুলে স্কুলে ঢুঁ মারি। কি যেন শিল্প-বিদ্যালয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলে না ?

—আহা! জানোনা বুঝি! আই. এ. পাস করেই তো বি. এতে ভর্তি হতে পারিনি। বসে থাকতে হয়েছিলো। তাই সরকারী ট্রেনিং একটা নিয়েছিলাম।

—কিসের ? তুলোর বেড়াল ? আঁশের সাজি ?

—ওসব আজকাল কেউ করে না, জানলে! আমরা নিয়েছিলাম জুনিয়ার ট্রেনিং। তাতে চাকরিও করা চলে স্কুলে।

—তো তাই ভালো!

—স্কুলের কাজে ক'টা টাকা পাবো রাখালদা ?

—দেখাই যাক। আসলে দুনিয়াটার আসল চেহারাটা ভারী ॥, জানলে সুজাতা।

—কেন ?

—দেখছো না! এ দুনিয়ায় অসীমরা গাড়ি চালায়, তোমার বাবার মতো মানুষরা চাপা পড়েন। আর আমার আর তোমার মতো ছেলেমেয়ে রবিবারের বাজারেও বাড়ি ফিরতে ট্রাম পায় না। দেখছ না ?

সুজাতা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—ঐ লোকটার নাম ক'রো না রাখালদা। আমি সইতে পারি না।

রাখালের গলায় কেমন রহস্যের সুর লাগে। সে বলে—আমার কিন্তু ধারণা একটু পালটিয়েছে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ লোকটার মধ্যে খানিকটা ক্ষ্যাপামিও রয়েছে। নইলে সেদিন অমন ভাবে এলো। আবার মার-ধোর খেয়েও একবারও নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলো না। কেমন যেন মানুষটা!

—তুমি পারো দয়া করতে রাখালদা। আমার কেন তেমন কথা মনে হবে বলো ?

গম্ভীর হয়ে যায় সুজাতা। পলকেই তার ওপর যেন একটা আবরণ নেমে আসে। এই সুদূর হয়ে যাবার ভাবটাকেই ভয় পায় রাখাল। আর কথা বললে না।

বাড়ি ফিরবার মুখে ট্রামের জানলায় মাথা রেখে কত কথাই যে মনে হয় সুজাতার। ক্লান্তি আর হতাশা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফেরা। কবে এই পরিক্রমার শেষ হবে ? সামান্য পুঁজি। তাই ভেঙে ভেঙেই দিন চলছে। ছোট একটা লোক্যাল রেডিও সেট ছিলো। বেচে দিলো সেটা রাখালের মারফতে। চল্লিশটা টাকা, তা-ই সই।

কিন্তু চালের মণ যেখানে ত্রিশ বত্রিশ, সেখানে চল্লিশটা টাকার দাম কি ? রাখাল নানাভাবে সাহায্য করছে, তাও ঠিক ! বাড়িতে সেদিন একপাঁজা লাল নীল কাগজ, কাঁচি, আঠা সুতো নিয়ে এসেছে। বলে—মাসীমা, কি করেন কি ? দুপুরবেলা ঘুমোবেন না, অম্বল হবে। দেখি বানিয়ে দিন দিখিনি ক'খানা ঘুড়ি। যদি উতরে যায়, বুঝলেন না ? পাড়ার মণিটা কাজ কাজ করে ঘুরছে, দোব ওকে ঘুড়ি লাটাইয়ের একটা দোকান ক'রে—ঐ বিশুদেরই রকে বসবেখ'ন।

আবার এক বোঝা রঙীন সাদা কাপড় লেসের টুকরো টেনে আনলো। বললে—সুজাতার যা ব্যাপার। ঊষা মেশিনটা যে মেসোমশায় কিনলেন অত উদ্যোগ করে, সেটা কি বেচে ফেলেছো ?

—না। কেন ?

—মাপ রেখে গেলুম। এক ছাঁটের ইজার পেনি ক'টা বানাও দিখিনি ! ফেলে দিয়ে আসি ঐ বলাইবাবুদের দোকানে। হকার্স কর্নার-এ।

রাখাল যা করেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ সুজাতা। কিন্তু এ কথা কি সে বোঝে না, যে এই জোর কম্পিটিশনের বাজারে তাদের এই সব প্রচেষ্টা শেষ অবধি দাঁড়াবে না ? এ. জি. অফিসের কেরানী সে। পাড়ার লোকের দায় ঠেলতে রাখাল বিনে গতি নেই। রোগে পড়লে ওষুধ আনা ডাক্তার ডাকা থেকে শুরু করে মরলে পরে মড়া পোড়াতেও ঐ রাখালেরই দোর ধরতে হয়। মরার পরেও যে রাখালের কাজ ফুরোয় না, সুজাতাদের বাড়ির ব্যাপারেই তো তার প্রমাণ হলো। তবু দাম না দিলে দাম মেলে না। রাখালের কাছ থেকে এত অনকুণ্ঠ সাহায্য নিয়ে এমন করে নিজেকে কেন জড়াচ্ছে সুজাতা ? নিজেকে সে সব প্রশ্ন শুধিয়ে আর পারে না সুজাতা। দুটি হাত কোলে জড়ো করে চুপ করে বসে থাকে।

সুজাতাকে এখন বেশ ক্লান্ত কোমল দেখায়। মুখখানা চুরি করে দেখে রাখাল। বেশ মায়া হয় মনে। হাল্কা নীল জামা আর শাড়ির নীল পাড় মিলে গিয়েছে গৌর দেহে। সুজাতাও যে সুশ্রী, বুঝতে হলে এমনি একান্ত কোন মুহূর্তে তাকে দেখা দরকার। সর্বদা যেটা চোখে পড়ে, সেটা হলো তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের দীপ্তি।

সারাদিনের ক্লান্তি বয়ে বাড়ি ফিরলো সুজাতা। আর ফিরেই বিশ্রাম করে খেতে বসে মা'র কাছে শুনলো কথাটা। শুনলো যে অসীম এসেছিলো, আর চেক রেখে গিয়াছে। শুনে খাওয়া থামালো না। ভাতের থালায় হাত রেখেই বললো—নিলে কেন মা।

মা হাঁড়ি চেঁছে ডাল তুলে দিলেন পল্টুর পাতে। বললেন—সে যদি তুমি এখনও না বোঝ সুজাতা, আমি কি বোঝাব বল?

কুমড়োডগার ডাঁটা নখের আগায় চিরতে চিরতে সুজাতা ক্লান্ত মৃদুকণ্ঠেই বলে—বাবার সব সঞ্চয় কুড়িয়ে হাজার পাঁচেক রয়েছে। তাছাড়া হাজরার কাছে শুনলাম, বাবাদের চীফ অফিসার যিনি, তিনি ব্যবস্থা করে ফাণ্ড তুলে হাজার টাকা দেবেন। কাজ আমি একটা জোগাড় করে নেবই। এ ক্ষেত্রে, ও টাকাটা না নিলেই আমরা ভাল করবো মা!

মায়ের মন দুদিকে দোলে। তিনি বলেন—সে সত্যিই অনুতপ্ত। আর পল্টুর কথাই বললো।

—তার টাকা দিয়ে.—থালার উপরে হাত ধুতে ধুতে সুজাতা বললো—তার টাকা দিয়ে যদি পল্টুকে পড়াই, সে গ্লানি যে আমি কোনদিনও ভুলতে পারব না।

মা-র মর্মস্থলে লাগে। তিনি বলেন—সুজাতা, ফেরত দেবে বা রাখবে, তুমি বুঝে করো। আমি কিছু বলবো না। তবে মন এক,

হৃদয় এক, আর জেদ হলো অন্য কথা। তুমি ভাল করে ভেবে বুঝে যা হয় করো।

—তাই করবো মা।

সুজাতা তারও পরে মাকে মিষ্টি এনে খাওয়ায়। ভাইকে তুলে শোয়ায়। মশারি টাঙায়। তারপর বাসন ক'খানা মাজে। দালান ধোয়। উনোন সাজিয়ে রাখে। ভাল শাড়িটা খাটের বিছানার তলে চেপে রাখে। ভেজা চটি খাড়া করে রাখে দেয়ালে। ব্লাউজটা সাবান দিয়ে মেলে দেয় দড়িতে। সকাল হলেই কাজ। সকাল হলেই যুদ্ধমান জীবন শুরু।

এখনো কাজ ফুরোয়নি সুজাতার। ছোট বাতি জ্বেলে সে প্রাণপণে ইকনমিক্‌সের নোট মুখস্থ করে। পড়তে পড়তে চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। ঘুমজড়ানো চোখ, চিবুকের নীচে হাতখানা চেপে ধরে বসে থাকে সুজাতা। মনে হয় অসীম অন্যান্য বহু আত্মকেন্দ্রিক মানুষের মতোই মূর্খ। মূর্খ না হ'লে বারবার এখানে আসে সে ?

সে রাতটা কিন্তু অসীমের খারাপ লাগে না। ছেলেটির মা গ্রহণ করেছেন তার চেক্‌। মন থেকে যেন নেমে গিয়েছে এক মহা গুরুভার।

আজ যেন নিজেকেও ভালো লাগে অসীমের। রাতে বিছানায় গড়িয়ে পড়তে না পড়তে ঘুম নেমে আসে চোখে। ঘুম তো পাবেই। ক'টা দিন ভালো করে ঘুমোয়নি যে।

আর কি কি দায়িত্ব রইলো তার ? আর কাকে সে অসুখী করেছে ? কার কাছে আবার যেতে হবে ? ভাঙা মন আবার নতুন করে জোড়া লাগাতে হবে ? গোপা।

কিন্তু গোপা কি ? ক্লান্ত ও ঘুম পাওয়া মনটা অবাক হয়ে যায়

অসীমের। গোপার সম্পর্কে কোন চিন্তাই সে এ কদিন করেনি। এমন কি গোপা যে আসেনি, ফোন করেনি, নীল কাগজে 'ডুষ্টু' ব'লে সম্বোধন করে চিঠি লেখেনি, সেজন্যে তো কই এতটুকু উদ্বেগ নেই তার? আর একটা কথা বুঝতে পারছে সে। কথাটা ভালো নয়। তবু সত্যি। নদীর বুক থেকে ক্রমে যেমন চর জাগে, তার বুক থেকেও এই সত্যটা ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। সে কথাটা হলো, গোপা ইতিমধ্যেই অনেক দূরে সরে গিয়েছে। সে আর গোপার কথা ভাবছে না। গোপা কি কোনদিন-ও কাছে ছিল? মনে ত' হয়না। কাছে যদি সত্যই কোনদিন এসে থাকে সে, তবে কি আজ এমনি করে সুদূর হয়ে যেতো গোপা?

আর ভাবতে পারে না অসীম। বালিশের গহীনে মাথা ডুবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিঃঝুমে।

ভারমুক্ত বিবেক। সকালের বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে এতটুকু বাধে না অসীমের। অথচ এই ঝকঝকে রোদ আর সুন্দর প্রশান্তি যে কতখানি প্রবঞ্চনা বুকে লুকিয়ে রেখেছে, তা বুঝতেও পারে না অসীম। বুঝতে পারে না, মনটা যে স্বস্তি আর শান্তিতে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে, সেও ক্ষণিকেরই জন্য।

কাল অনেক রাত অবধি সুরেশের ঘরে বাতি জ্বলেছে কেন, সকালে তারই তদন্ত হয়। সুরেশ গলায় তোয়ালে বেঁধে চুপ করে বসে থাকেন, অসীম দাড়ি কামিয়ে দেয়। বলে—ইলেক্ট্রিক শেভিং সেটটা ব্যবহার করো না কেন?

দাড়ি কামাবার সময়ে সুরেশ কথা বলেন না। অব্যক্ত একটা শব্দ করেন। তারপর বলেন—যত সব কৃত্রিমতা। তোমরা বাঁচতে জান না, বুঝলে খোকা! ইলেক্ট্রিক শক্ লেগে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে, সেটা কি ভাল হবে?

—তা যদি বলো, তবে মুখ ভর্তি করে দাড়ি গোঁফ রাখলেই পারো।

—আহা, সভ্য সমাজে চলতে ফিরতে হবে তো?

—তবে আর 'নেচার' 'নেচার' কোর না।

—তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না। তোমরা মোটে বুঝতে চাও না। চিরকাল আমি নতুনের দিকে পক্ষপাতী। একবার বলেছিলাম না? যে রান্নাজিনিষ-ই আর খাব না। যা খাব, সব কাঁচা-ফলমূল? তা তোমার মা-র জন্যে ত' নতুন কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। কেন, কয়লার রান্না আমি তুলে দিতে চাইনি? তখন তোমার মা ছিলেন। বললুম সব কুকারে রাঁধো।

—হ্যাঁ। গ্র্যাণ্ড গিরিডি এক্সপিরিয়েন্স আমার দিব্যি মনে আছে।

—কেন, কি হয়েছিলো?

—মনে নেই? চাল ডাল মাংস সব চাপিয়ে দিয়ে তুমি ঘড়ি ধরে বসে রইলে, আর এক ঘণ্টা বাদে দেখা গেল সব হয়েছে শুধু নীচে আগুনটি জ্বালোনি। সেদিন আবার তোমার বন্ধু ঐ ক্ষেত্রকাকারা পৌঁছবেন গিরিডি—তাঁরা-ও খাবেন। সে কি কাণ্ড! শেষ কালে আবার বাজারে যাওয়া হয়। —মা আর বিশুদা আবার রাঁধে স্টোভ ধরিয়ে, তবে না হলো?

—আঃ, সেই সব কথাই বা শুধু মনে রেখেছ কেন? আমি কি কি করেছি, সেগুলো ভেবে দেখ। কেন, গত বছর তুমি কাশ্মীরে গেলে পরে আমি নিজে রেঁধে খাইনি? বলুক, বিশ্ব বলুক। বিশ্বনাথ গম্ভীর ভাবে বলে।

—হ্যাঁ, তা ডিম ভাজা, আলু ভাজা এ-সব চলতো বটে!

—কিন্তু কাল রাতভোর কি করেছ? বিশ্বদা বলছিল বাতি নেভাওনি।

বিশ্বনাথের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা দেখা যায় একান্তই অগভীর। সুরেশের বারংবার ইশারা সত্ত্বেও বলে—রাত দুটো অবধি ঐসব বোম্বেটে বইগুলো পড়েছেন আর কি। দেখ না!

অসীমের চোখে পড়ে সত্যিসত্যিই সেল্‌ফের ওপর পাঁজা করা সেই নিষিদ্ধ বইগুলো—আফ্রিকার ভয়ঙ্কর, ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন, সুন্দরবনে ডাইনোসোরাস, নারী গোয়েন্দার নূতন খবর—সাজানো আছে সারি সারি, পাশাপাশি। অবাক হয়ে সে বলে—কি, তুমি এইগুলো পড়েছ নাকি রাতভোর?

—আজ দেখলে তুমি? বিশ্বনাথ চা-এর জিনিস গুছোতে গুছোতে বলে—উনি, সেক্রেটারিবাবু, আর সেই ডেপুটি মশাই—তিন মাথা এক হ'লে রক্ষে আছে? যতো ইস্কুলের ছেলেদের বই, এখেনে বসে পড়া হবে। একজন পড়বেন আর দু'জনায় হেসে খুন হবেন। সে যা রগড়!

সুরেশ গম্ভীর হয়ে বলেন—নিজে না পড়লে জানছি কেমন করে, যে বইগুলো ভাল কি মন্দ?

তারপর হাসতে হাসতে বলেন—খোকা, তুমিও পড়তে পারো। বেশ লাগে। ভূগোল, ইতিহাস, সম্ভব অসম্ভব সব জট পাকানো। তবু বেশ, ঐ আর কি, সময়টা কেটে যায়!

—সেক্রেটারিও?

—আহা! ক্ষেত্রনাথ, বিজয়, ওদেরও তো মাঝেসাঝে একটু হালকা হতে ইচ্ছে যায়। কি করে বল দেখি? তা আমরা তো তোমাদের খোঁচাতে যাই না। আর যে দুটো ছেলে ডিটেকটিক বের করেছে নয়? ভারী তুখোড়? কি যেন নাম? এই গেল সুন্দরবনে—সেখানে মঙ্গলগ্রহের ডাক্তার এসে ইনজেকসান দিয়ে পোকামাকড়গুলোকে অতিকায় জন্তু বানাচ্ছে—ধরে ফেললে আবার গেল—তার পরের বইটাতে-ই দেখবে—আবার গেল

আসামের জঙ্গলে।' তেল খুঁড়তে গিয়ে গোপন আগ্নেয়গিরি—সে ভাবী মজার।

অসীম বলে—কি করে আর জানছি বল? ছোটবেলা, হাতে শুধু বিদ্যাসাগর আর রামমোহনের জীবনী সিরিজ ছাড়া কিছু দিতে না। যে করে পড়তে হয়েছে।

—আহা, ছোটবেলা সকলেই কি…?

—ছোটবেলা শিশুপাঠ্য বই পড়েনা তো কি তোমার মতো বুড়ো বয়সে পড়ে? কি বলছ?

সুরেশ এবার শুধুই হাসেন। অসীম বলে

—না, না, আমি কিছু বলছি না! তবে ঐ রান্নার এক্সপেরিমেণ্টগুলো করো না।

এতক্ষণে সুরেশের মহাগোপন একটা খবর ধরে ফেলেছে অসীম। সুরেশ হাসতে হাসতে বলেন—ক্ষেত্রনাথেরও বাতিক আছে। ঐ যে দালদার বই রয়েছে না? তাতে বাজ্যির রান্নাবান্না লেখা আছে। কি জানো, আমরা ঠিক করি কাল ট্যাড়সের 'ভিণ্ডি ফ্রিকাসি' রাঁধবো। উপকরণগুলো আনি। ঠাকুরটাকে বের করে দিই। তোমার ঐ ছোকরাটা বেশ, ও আমাদের হিটার জ্বালিয়ে সব জোগাড় করে দেয়। আমি পড়ি, আর ক্ষেত্রনাথ করে—বেশ কাটে সময়টা।

দুজনেই হাসাহাসি করেন। সুরেশ বলেন—আজ মিনার্ভার ছবিটা দেখে এলে হয়।

—বেশ তো। তৈরি থেকো। ছ'টায়।

—না, না—বেহালার স্কুলের জন্য টিচার দরকার তিনজন। সেক্রেটারি আসবেন। বিজ্ঞাপন দিতে হবে। নতুন স্কুলটা মেয়েদের। খাটতে হবে। নইলে দাঁড়াবে না স্কুল।

সেই কথাই ঠিক থাকে।

অফিসে বসে কাজ করতে করতে সাঞ্চের সময়টাও কেটে যায় কাজে। হঠাৎ বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠিয়ে তাই সুজাতা যখন এসে ঢোকে, তার বিস্ময় যেন থামে না।

সুজাতা যেন রাজ্যের প্রশান্তি নিয়ে এসেছে। সে ঘরখানায় চোখ বুলিয়ে দেখে ভাল করে। ছোটখাটো অফিসটি। জনা পনেরো বিশ স্টাফ হবে। সাজসজ্জায় আছে বনেদীয়ানা। চোখধাঁধানো জাঁকজমক নেই। মালিককেও দেখা যায় গলা-খোলা সাদা শার্ট আর ট্রাউজারের মামুলী পোশাকে। সমস্তটা দেখে আঁচ করে নেয় সুজাতা। অসীমের হাতের কলমটা মাঝপথে থেমে রয়েছে। অসীমের মুখ, কান, লাল আর গরম হয়ে উঠেছে। ঘাড় বেয়ে ঘাম পড়ছে টপ টপ করে। এত নার্ভাস হবার কি আছে। অসীম বলে—আপনি ?

—হ্যাঁ।

—বলুন !

—চেকটা ফেরৎ দিতে এসেছি !

—কেন ?

—নেওয়া সম্ভব নয় ব'লে। আপনাকে সেদিন বলেছি অসীমবাবু, যে আপনার কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

—কিন্তু কেন ?

সুশ্রী, তরুণ একটি মেয়ে। দুঃখের রুক্ষ ছাপ তার কেশে বেশে। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর কেন তার মন ? কেন সে অসীমের কথা শুনতে চায় না ? অসীম কি বলতে চায় আরো, মেয়েটি তা না শুনেই বলে—আমার মা তখন এ-কথা বলতে পারেননি। আমাকে দিয়ে তাই বলে পাঠালেন।

ব্যাগটা হাতড়ে ঘর্মাক্ত আঙুলে খামটা বের করে রাখে

সুজাতা। রেখে, যেন আর একটু দাঁড়ালে সে ভেঙে পড়বে, এমনই ত্রস্তে উঠে পড়ে। বলে—সব কিছুর ক্ষতিপূরণ হয় না। আপনি বৃথাই কষ্ট করলেন, আর কষ্ট দিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে চেক্ দেখিয়ে তবে আপনার ঠিকানা পেলাম। থাক, আর আশা করি এমন অবকাশ হবে না।

দরজার কাছে উঠে গিয়ে একবার তাকায় সুজাতা। তাকিয়ে বেদনাহত চোখ দু'খানা বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে যায়। অসীমের মুখখানায় যেন কালি লেপে দিয়েছে কেউ। চোখে হতাশা আর যন্ত্রণা। সুশ্রী মুখখানা আস্তে রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে।

ক্ষণিকের অতি ক্ষণিকের বিভ্রান্তি। তারপরেই বেরিয়ে যায় সুজাতা।

একটা চাকরীর জন্যে কলকাতা সহরের সম্ভব অসম্ভব সব জায়গাগুলোয় খুঁজে খুঁজে মরে সুজাতা। কাজ পাওয়া যায় না। এক একটা দিনের হতাশা কুড়িয়ে ট্রামে বাসে ফিরতে ফিরতে সুজাতা ভাবে, কাজ করে না বলে এদেশের ছেলেমেয়েরা রসাতলে যাচ্ছে, আর অন্য প্রদেশের মানুষ এসে এ দেশের ছোট বড় সব কাজ-ই নিয়ে নিচ্ছে, এই মর্মে মন্ত্রী উজির নাজির কোটাল সকলেই রোজ বাণী দেন কাগজে। তা এই ত' সে, আর তার মতো আরো কতজন কাজ খুঁজে ফিরছে দিনরাত। তারা কাজ পায়না কেন? তাকে কেউ কাজ দেয়না কেন? কতরকম কাজ-ই ত' আছে।

তার এই ভুয়ো আত্মসম্মান বোধ-ই তার সর্বনাশ করবে। এ কথা তার মা তাকে সেদিন-ও বলেছেন। সুজাতা-ও যেন অবুঝ হয়েছে। এরকম কথা যে তার মা তাকে আগে কতবার কতরকমে বলতেন, সে কথা তার মনে থাকে না। তার মনে হয়, সেই দুই

হাজার টাকার চেক সে ফেরৎ দিয়েছে বলেই মা তাকে অমন করে বলেছেন! আবার খুঁটিয়ে দেখলে এ-ও সে বোঝে, যে মা-র ওপর সে অবিচার করছে। মা তাকে মুখে কিছু বলেন না। বরঞ্চ এত বেশী চুপচাপ থাকেন, যে সেটাই সুজাতার অস্বস্তি-র কারণ হয়েছে। অনেক সময়ে দেখেছে সে, রান্না করতে করতে, বা অন্য কাজ করতে গিয়ে, অথবা একেবারে বিনাকাজে, গালে হাত দিয়ে তিনি চেয়ে আছেন একেবারে শূন্যদৃষ্টিতে। সে দৃষ্টিতে এমন এক চূড়ান্ত রিক্ততা এবং হতাশা, যে সেদিকে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি সুজাতা।

আত্মসম্মান যে তার ভূয়ো নয়, তার-ও যে একটা যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি আছে—তা বোঝাবার জন্য সুজাতার মনে হয়েছে তার আচরণ-ই যথেষ্ট। তাই দেখেই তার মা-র বোঝা উচিত ছিল।

সে শেষ অবধি তার কোনো আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে বাকি রাখেনি। বাবার যে জ্ঞাতিভাই কোন্ এক মন্ত্রীর সেক্রেটারী—তিনি যে তাকে কি রকম ঘোরালেন! একটা জুনিয়র ক্লার্কের চাকরী রাইটার্স বিল্ডিং-য়ে তাঁদের দপ্তরে—তার কথা জেনে-ই সুজাতা জড়িয়ে পড়লো বেশী। একেই বোধ হয় বলে আশার ছলনে ভোলা।

—ভাবছিস্ কেন, আমি যখন আছি!

এই বলে তিনি অফিসে তাকে কমদিন বসিয়ে রাখেননি। অমুকদিন একটা খবর পাওয়া যাবেই যাবে—এই শুনে সুজাতা তার আগের দিন কাপড়জামা কেচে, ইস্ত্রী করে—পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সময়ের কিছু আগেই এসেছে। চাকরীর প্রয়োজন যখন তার-ই তখন তাগিদটা তার-ই বেশী থাকা উচিত। গিয়েছে, বসে থেকেছে—সকাল গড়িয়ে টিফিন টাইম হয়েছে—বেয়ারা-রা তার দিকে চেয়ে ঢুকতে বেরোতে হেসেছে। তাদের চোখের

চাহনি শরীরের বিশেষ জায়গায় অনুভব করে সুজাতা গরম হয়ে গিয়েছে। তারপর তার সেই কাকার ছোকরাটাই জানিয়েছে—সেক্রেটারী মশাই ত' আজ তিনদিন ধরে ট্যুরে বেরিয়ে গেছেন।

—আগে ঠিক ছিলনা বুঝি?

—হ্যাঁ, এ ত' গত মাসের শিডিউল্।

ট্যুর কেমন করে ঠিক হয় তা জানে না সুজাতা। তবে লোহার সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে—রাইটার্স বিল্ডিং-য়ের পেছন দিকটার কুশ্রী দেয়ালগুলো দেখতে দেখতে—এ কথা সে মনে না করে পারেনি, যে ট্যুরে যাবার কথা যদি এতদিন ধরেই ঠিকঠাক—তবে কেন তাকে এমনভাবে কথা দেন তার কাকা?

কাকা এসে-ও কোন সঙ্কোচের ভাব দেখাননি। যে হ্যাঁ, তিনি কথা দিয়েছিলেন, তাঁর কথা অনুযায়ী এসেছিলো সুজাতা—সে কথার খেলাপ তিনি-ই করেছেন—কই, তাঁর দিক থেকে সে জন্য কোন কথা বলবার নেই। এরকম হয়। হয়ে-ই থাকে। চাকরীর ব্যাপার—তাতে আজকালকার বাজার।

আরো গেছে সুজাতা—তাঁর বাড়ীতে, তাঁর অফিসে—তাঁর কথামতো এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে দরখাস্ত লিখে নিয়ে।

কিছু হয়নি। পরে জেনেছে, সে ঘোরাফেরা যখন করছিল, তখনই সে চাকরীতে অন্য একটি মেয়ে বহাল হয়ে গিয়েছে, আর ইতিমধ্যেই চাকরীতে সে তিন সপ্তাহের পুরনো হয়ে এলো।

দুঃখে ও বেদনায় সুজাতার চোখ ফেটে জল আসতে চেয়েছে। সে কোনমতে নমস্কার করে, কাকা যে আরো কি কি বলছেন না বলছেন না শুনে-ই বেরিয়ে আসে। বাড়িতে আর ফিরতে ইচ্ছে হয়না সেদিন। তবু ফিরতে হয়। মা-কে আর মুখ ফুটে হতাশার কথাটা বলেনা। সুজাতার মনের কথা খুলে বলবার মানুষ কমে আসছে ক্রমশ। রাখালের সঙ্গে-ও আজকাল বেশী দেখা হয় না।

সে নাকি আরো ভালো কোনো চাকরীর চেষ্টা করছে। সেই জন্যই আজকাল বেশী আসতে পারে না।

শুধু একজায়গায়? তারপরে-ও তার সুরেনকাকার বাড়ী। বাড়ী থেকে অফিস। অফিসের কাজে তার কোন যোগ্যতা নেই জেনে ইস্কুলের চাকরীর চেষ্টা।

কিছুতেই কিছু হয় না। সুজাতার নিজের সম্পর্কে-ও হতাশা জাগছে। এক একটা বিফল দিনের শেষে ট্রামের জানালায় মাথা হেলিয়ে বসে সুজাতা আঁধার ময়দানটার দিকে চেয়ে ভাবে—তার সম্পর্কে তার বাবা কত কথা ভাবতেন—তার যোগ্যতা, তার বুদ্ধি, তার শিক্ষা। মনে হয়, সে সবই ছিল স্নেহবৎসল পিতৃহৃদয়ের দুর্বলতা। আসলে তার কোন যোগ্যতাই নেই। নেই যে, তা ত' এখনই প্রমাণিত হচ্ছে। সংসারের নিক্তিতে ওজন হয়ে যাচ্ছে সে।

সহসা মনে হলো সুজাতার, যে মুশকিল আসান হলেও হতে পারে। মনে হলো যে, ঘন কালো মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে এসে ঢেকে ফেলেছিলো তার আকাশ, সে মেঘ বোধ হয় কেটে যাবে। উঠবে সূর্য। দেখা দেবে আবার নীল আকাশ।

যে লোকটার কথা ভাবতে চায় না সে, তার কথা যদি বারবারই মনে পড়ে, কেমন লাগে? মনে পড়ে, যখন মনে হয় কাজ পাচ্ছে না বলে মা তাকে নীরবে অভিযোগ করছেন। মনে হয়, যখন পলটু কষ্ট পাচ্ছে। বরাবরই একটু কমজোরী ছেলে। ভালোমন্দ দূরে থাক, ওর তো একটু দুধ, একটু মাছ খাওয়া দরকার।

ঘরে জমে উঠছে অভাব। পটুর জামা প্যাণ্ট নতুন করালে ভালো হয়। মা অগত্যা বাবার ধুতিগুলি ব্যবহার করছেন। কিন্তু তবু তার নিজের শাড়ি দরকার, চটি দরকার। এত রকম দরকার আছে সংসারে। তারপর তাদের সংসারে অভাব পড়ছে বলে তো

অন্য সংসারে লোক-লৌকিকতার প্রয়োজন বসে থাকছে না। মধ্যবিত্ত সংসারগুলো যেন পরস্পরকে শুষে বেঁচে রয়েছে। এর প্রয়োজনে ওর ঘরের নিমন্ত্রণ আসে। আর খেতে পান বা না পান, সুজাতার মা-কে তখন অন্ততঃ দুটি রূপোর টাকা হাতে আশীর্বাদ নিয়ে যেতেই হয়। এড়িয়ে যাওয়া চলে না। আয় নেই, ব্যয় আছে। কেমন করে চলে?

এমনি সব সময়ে সুজাতার মনে পড়ে সেই একখানা তরুণ সুশ্রী মুখ। দুঃখ ও হতাশায় ম্লান দৃষ্টি। মনে হয় মা কিছু বলছেন না মুখে, পল্টুও কিছু বলছে না, কিন্তু নিশ্চয় তারা অভিযোগ করছে মনে মনে। মনে হচ্ছে তাদের, যে আজ সেই দু'হাজার টাকা থাকলে আমরা অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম।

মনে পড়ে আর অদ্ভুত একটা জেদ জাগে সুজাতার মনে। সে নিজে দাঁড়াবে। দাঁড়াবে তার বাবার প্রতিভূ হয়ে। মা আর ভাইয়ের দুঃখ দূর করবে।

এমনি সময় এলো দুঃখদিনের অবসানের নিশানা। এমন কিছু নয়, স্কুলের চাকরি। নতুন একটা স্কুল হয়েছে বেহালাতে। কোনো এক আদর্শবাদী লোক এর পেছনে আছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তা তিনি পেছনেই থাকতে চান। আপাতত স্কুলটা ক্লাস এইট পর্যন্ত। অচিরে হাইস্কুল হবে। তবে যেহেতু এখানে নিকটবর্তী বাস্তুহারা কলোনির মেয়েরা আসবেন পড়তে—তাঁদের দিকে, অর্থাৎ জাতীয় সমস্যাটির দিকে সংবেদনশীল দৃষ্টি রেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, যে তাঁদের স্কুলে সেইসব শিক্ষয়িত্রী চাই, যাঁরা এঁদের হাতের কাজ টুকিটাকি শিখতে সাহায্য করতে পারবেন। শুধু লেখাপড়া জানা এম. এ. বি. টি. হলেই হবে না—তরুণ ও কোমল মনের শিক্ষিতা মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে। শেখাতে হবে হাতের কারিগরি কাজের টুকিটাকি। যাতে ছাত্রীরা প্রয়োজনে

তৈরি করতে পারে কিছু। সে সব জিনিস বাজারে নিয়ে বিক্রী করবার বন্দোবস্ত, তাও স্কুলের তরফ থেকেই করা হবে। শিক্ষয়িত্রীদের কাছে অনেক বেশি আশা করা হচ্ছে। মাইনের বেলাতে তাই দেখা যাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা। মাইনে একশো চল্লিশ টাকা। বেশি যোগ্যতাপূর্ণ শিক্ষয়িত্রী এলে তাঁকে বেশি মাইনে দেওয়া হবে।

এই চাকরি। হেডমিস্ট্রেস আর সেক্রেটারী দু'জনেই বেশ রাসভারী অথচ সংবেদনশীল বলে বোধ হলো। চাকরির নিয়োগপত্র সুজাতার হাতে দেবার সময়ে তাঁরা জানালেন, এ কাজ আপাতত অস্থায়ী। তবে তিনমাস বাদে গভর্নিং বডির সামনে ইণ্টারভিউ হয়ে চাকরি পাকাপাকি হবে।

কাজ পেয়েই সুজাতা ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে টিউশনির টাকাটা নিলো। তিরিশটা টাকা নয় তো হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে সে। বেহিসেবী খেয়াল-খুশিতে পা দু'খানা ডানা মেলে উঠে যেতে চাইলো মাটি ছেড়ে। পলটুর শার্ট প্যান্ট গেঞ্জী আর মা-র জন্যে একখানা থান সে কিনে ফেললো। মা বললেন—কি রে, কি ব্যাপার ?

—বাঃ, চাকরি পেয়েছি না ? ব'লে আজ সুজাতা মা-র গলা জড়িয়ে হেসে কেঁদে ছেলেমানুষী করলো।

আজকে এই খুশির দিনে রাখালও এলো। রাখালকেও মিষ্টি খাওয়ালো সুজাতা। হাতলভাঙা কাপে চুমুক দিয়ে রাখাল বললো—আজকে অসীম মৈত্রকে দেখলাম, জানো ?

—কোথায় ?

সুজাতার হাতে চামচটা থেমে রইলো। রাখাল বললো—মার্কেটের সামনে। তাঁরই মতো আরো দুটি তিনটি বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে। ফুলের তোড়া, বেলুন হাতে—আরো অনেক কিছু।

—বেশি ফুর্তির মাথায় গাড়ি না চালালেই বাঁচি। কি বলো রাখালদা ?

রাখাল বলে—কি জানো, ওটা সত্যিই অ্যাক্সিডেন্ট। সকলেই বলে, য়ে ভদ্রলোক এমনিতে ভালোই। ব্যবহার, কথাবার্তা—

—কি দরকার রাখালদা পরের কথায় ?

—মনে হলো ভদ্রলোকের চেহারা বেশ কাহিল হয়ে গিয়েছে।

—খুব যে সহানুভূতি দেখছি।

—মেরে ধরে নিজের কেসটা খারাপ করে ফেলেছি। নইলে গিয়ে একটা ভালো চাকরির চেষ্টা করতে পারতাম।

সুজাতা বহাল হয়ে যায় নতুন কাজে। কাজটা তার খুব ভালো লাগে। দশটা থেকে তিনটে অবধি স্কুল হয়। তিনটে থেকে চারটে হয় হাতের কাজ।

সুন্দর স্কুলবাড়িটি। সবুজ জমির ওপর ফুলবাগান। সাদা কোঠাঘরের ওপর লাল টালির চাল। হেডমিস্ট্রেস সতী সেনের বয়স হয়েছে। তবু যেন অল্পবয়সের মনের দুঃখবেদনা বোঝাবার অবাধ অধিকার তাঁকে দিয়েছেন ভগবান। খুব একটা কথা বলেন না। মোটাসোটা মানুষটি। অল্প অল্প হাসেন। এমন কিছু আছে তাঁর ব্যক্তিত্বে, যে কিছুক্ষণ কাছাকাছি বসলেই সহজ হয়ে মন খুলে ধরতে ইচ্ছে করে। বড় সুন্দর স্বভাব।

সুজাতাকে দেখেই তিনি হাসিমুখে বলেন—এই অল্প বয়স, পারবে তো ? দেখ, আমি কিন্তু প্রথম থেকেই বলছি—তুমি বলে কথা কইব। রাগ করলে চলবে না। আর, আমি শিক্ষকতা করছি বাইশ বছর ধরে। খুব কড়াকড়ি করে চললে কিন্তু হবে না।

ব্যবহারটি মিষ্টি। তাই বলে কাজের বিষয়ে ছেড়ে কথা বলেন

না। বললেন—ছাত্রীদের সঙ্গে মিশে যাবে, ওদের মন বুঝে চলবে। তাই বলে রাশ ছেড়ে দিলে চলবে না। যদি মনে কর গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তাহলে আমি বরং বলবো, মিশো না ওদের সঙ্গে। গাম্ভীর্য আর সম্মান রেখে চলো।

—চেষ্টা করবো। বলে সুজাতা।

কাজ করতে তার ভালোই লাগছে। মেয়েদেরও ভালো লেগেছে তাকে। আর সুজাতার সহজাত একটা শিল্পবোধ আছে। পুতুল, খরগোস, কুকুর, হাতী এসব বানাতে পারে সে চমৎকার। পুঁতি বসিয়ে ব্লাউজে কারুকাজ করতে পারে, বানাতে পারে মেয়েদের বটুয়াব্যাগ। কাগজ কেটে চমৎকার ফুল, পাখি, এসবও বানাতে পারে। সামান্য জিনিসকে হাতের কাজের গুণে সে সুন্দর করে তুলতে জানে। মেয়েদের সঙ্গে মিশে সে নানারকম কারুকাজ করে। স্কুলটা নতুন হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট মশাই নাকি এই ধরণের স্কুলের পেছনে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে চান। হেডমিস্ট্রেসকে সুজাতা বলে—কলোনির মেয়েগুলিকে যখন স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই আমরা, ওদের চামড়ার কাজ শেখালে কেমন হয়? সত্যি একজন কাজ-জানা লোক আনুন না সতীদি। আমি ঠিক শিখে নেবো এক মাসে। তারপর মেয়েদের শেখাবো।

অমনি লোক আসে, শেখানো হয় চামড়ার কাজ। সতী আবার বলেন—স্কুলটা ভালো করে দাঁড়াক। তখন রান্নার পাস-করা ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট একজনকে আনবো। তুমি ভাবছো কি সুজাতা, মেয়েরা যদি কেক, চানাচুর, শুকনো মিষ্টি এসব তৈরি করে স্কুলের মাধ্যমে বিক্রী করতে পারে, ভালো হয় না?

বিকেল গড়িয়ে গেলেও সুজাতার যেন যেতে ইচ্ছে হয় না। এই লক্ষ্মী মেমোরিয়াল স্কুলের ময়দানের সবুজ ঘাসে, ঠাণ্ডা বাতাসে কি যেন শান্তি আছে। ভারী ভালো লাগে সুজাতার। বাড়িতে

ফিরেও মনের খুশিটা মুখচোখে লেগে থাকে। সতী সেন বলেছেন তাকে নিশ্চয়ই পার্মানেন্ট করা হবে। প্রেসিডেন্ট ও গভর্নিং বডিং তখন ইন্টারভিউ করবেন। তবে সেটা তার ক্ষেত্রে নেহাৎই মামুলী একটা আইন বাঁচানোর ব্যাপার হবে।

এমনি করেই এগিয়ে আসে সেই দিন। সতীদি বারবার বলেন—সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট আর পুরো গভর্নিং বডি থাকবেন। তোমরা দুটি মেয়ে আছো। তুমি আর বিনীতা। বিনীতা অঙ্কের টিচার। তা ছাড়া ও গেমস্ শেখাবে। ওকে নিয়ে কোন মুশকিল নেই। মুশকিল তোমাকে নিয়েও নেই। তবে আগে থেকেই বলি, প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি সকলেই তোমাদের মনটা জানতে চাইবেন। শিক্ষা লাইনে কেন এসেছো, এর উৎকর্ষ কোথায়? সেই সময় বেশ ভাল ভাবে জবাব দিও। কেমন?

—আচ্ছা।

স্কুল সেদিন একটায় ছুটি হয়। আস্তে আস্তে গাড়ি আসতে থাকে। হাল্কা নীল রঙের ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়ি ঢুকে যায়। নিজের ঘর থেকে সেই গাড়ি দেখে সুজাতা ভাবে, এই রকম গাড়ি কলকাতায় কতো আছে? অসংখ্য? সেই দেখেছিলো না অসীমের অফিসে?

কিছুক্ষণ যায় প্রতীক্ষায়। তারপর ঘুরে আসে বিনীতা। ডাক পড়ে তার। সুজাতা বলে—কি রকম? বিনীতা ভরসা জানায় ঘাড় নেড়ে।

সতী সেনের ঘরে সারি সারি চেয়ার পড়েছে। সেক্রেটারিয়েট টেবিল ঘিরে বসে আছেন সকলে। সুজাতা গিয়ে বসে। মুখ তোলে। চোখে চোখ পড়ে অসীমের সঙ্গে। অসীম বসে আছে মাঝখানে। সামনে ফাইল হাতে কলম।

সুজাতা মুখখানা পাংশুবর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে।

এও বোঝে যে, তার সমস্ত আত্মবিশ্বাসই তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। ভয়ানক দুর্বল বোধ করছে সে। কিছু বুঝতে পারছে না। এখানে অসীম কেন? অসীম তার ইণ্টারভিউ নেবে? অসীম এ স্কুলের কে?

সতী যেন উদ্বিগ্ন হয়ে তাকান তার দিকে। কিন্তু এখন তো আর তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বা সাহায্য করা সম্ভব নয়। সেক্রেটারি জিজ্ঞাসা করেন অসীমকে—বাবা কি খুবই অসুস্থ?

—না। ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কি। জ্বরটা খুব বেশি। মুখ তোলে না অসীম। এবার প্রশ্ন শুরু হয়। সেক্রেটারিই প্রশ্ন করেন। অন্যরা শোনেন অভিনিবেশ সহকারে। আর সুজাতা? সুজাতা প্রশ্নগুলির জবাব দিতে থাকে এমন করে, যেন তাকে ভূতে পেয়েছে। নিজের গলার স্বর শুনে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়। রুক্ষ, অবিনয়ী এক মেয়ের কণ্ঠস্বর। নিজেই সে বোঝে, যে স্কুল কর্তৃপক্ষের সামনে সে নিজের সম্পর্কে কিছুতেই ভাল ধারণা সৃষ্টি করতে পারছে না। সেক্রেটারি প্রশ্ন করে চলেন—আপনি শিক্ষয়িত্রীর জীবন বেছে নিলেন কেন?

—জানি না। সম্ভবতঃ অন্য ভালো কাজ পাইনি বলে।

—মেয়েদের হাতের কাজ শেখানোর উপকারিতা কি?

—বলতে পারি না।

এ সুজাতা নয়, অন্য কেউ কথা কইছে। সতীদি অবাক হয়ে যান তারপরে অসন্তুষ্ট হতে শুরু করেন।

—আপনাকে পার্মানেণ্ট করলে আপনি কি আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন?

—বলতে পারি না।

—শিক্ষয়িত্রীর জীবন সম্পর্কে আপনার খুব শ্রদ্ধা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে এলেন কেন?

—বাধ্য হয়ে। অন্য কোন কাজ পাইনি বলে।

কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকেন প্রশ্নকর্তা। তারপর বলেন—ধন্যবাদ এবার আপনি যেতে পারেন।

সুজাতা বেরিয়ে আসে। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। এ কি করলো সে? কোনমতে গিয়ে নিজের ঘরে বসে। ব্যাগটা নেয়। বিনীতাকে বলে—আমার শরীরটা খুব অসুস্থ লাগছে। সতীদিকে একটু বলে দিও ভাই। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সে বেরিয়ে এলে পরে সেক্রেটারি সতী সেনকে বলেন—আপনি মিসেস সেন এখনো মানুষ চিনতে শেখেননি। আপনি না এই মেয়েকেই কত প্রশংসা করেছেন? শুনলেন তো? কি উদ্ধত ব্যবহার! কি রুক্ষ কথা! না-না, এরা অনেক টাকার স্বপ্ন দেখে। বেশিদিন উৎসাহ টিঁকিয়ে রাখতে পারে না। বুঝছেন?

—বুঝেছি। এই মেয়েটির ক্ষেত্রে আমি সত্যিই ঠকেছি।

ক্লান্ত গলা সতী সেনের। তিনি বলেন—যা হোক, ভালো মেয়ে আরো পাওয়া যাবে।

সেক্রেটারি বলেন—মিঃ মৈত্র থাকলে ভারী অসন্তুষ্ট হতেন। ভাগ্যে তিনি নেই।

অসীম কোন কথা বলে না। সতী সেন তবু বলেন—আমার যেন কি রকম লাগলো! মেয়েটি দুঃখী। বাপ নেই। এসেছিলো যখন, কি রকম ঝড়-খাওয়া বিধ্বস্ত ভাব চোখে-মুখে। কাজটা হলো জেনে ঝরঝর করে কেঁদেছিলো। পার্মানেণ্ট হবার জন্যে সে কি চেষ্টা? কেন এমন করলো যে সুজাতা?

সুজাতা কেন যে অমন পাগলামি করলো তা কি সুজাতাই জানে? তারপরেই এলো তার পদত্যাগ-পত্র। কি যে হলো কোথা থেকে, সতী সেন তা বুঝলেন না, যে কেন অসীম মৈত্র বিশেষ অনুরোধ করে তাঁকে দিয়ে ঐ মেয়েটিকে দুই মাসের মাইনে

উপরি দিয়ে পাঠালো। বার বার বললো—আপনিই বলছেন মেয়েটি গরীব। মেয়েটির টাকার দরকার।

সতী সেন বললেন—তাই হোক। কিন্তু কি জানেন অসীমবাবু, আমার মনে হয় সুজাতা ভারী বোকা।

অসীম বললো—আমারও তাই মনে হয়। নির্বোধ জেদ যে কতখানি ক্ষতি করে!

সতী সেন অবাক হয়ে তাকান। যেন বিস্মিত হন অসীমের কথায়।

সুজাতা এবার সব বুঝতে পারে। আশ্চর্য কেন সে আগে বুঝতে চেষ্টা করেনি? এখন সে বুঝতে পারছে, যে লক্ষ্মী নিশ্চয় অসীমের মা-র নাম হবে। ছবিখানায় কথা মনে পড়ে।

এখন এমন-ও মনে হচ্ছে তার, যে মা আর ছেলেটি, কপালের গঠনে, চিবুকের ডৌলে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

সে-ও মূর্খ। নিজের কাজ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি; কোন কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। নইলে, এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কে—তাঁর নাম কি—জানা তার পক্ষে অসম্ভব ছিলনা। জানতে চাইলে-ই জানতে পারতো সুজাতা।

সতী সেন তাকে কি মনে করলেন? জীবনে শুভকামী মানুষ এত সুলভ নয়, যে অমন করে রূঢ় ব্যবহারে তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া চলে। কিন্তু, সুজাতার তবু উপায় ছিল কোথায়? এ ছাড়া আর কি করতে পারতো সে?

অসীম—যেখানে সুজাতা এতটুকু দাঁড়াতে চায়, একটা খড়কুটো ধরতে চায়-সেখানেই এসে পড়বে অসীম? এসে পড়বে আর এমনি করে তাকে আবার নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে যেতে হবে?

সুজাতার মনে হয় এ বড় অবিচার। এতদিন শুধু ভাগ্য-ই

তার বিপক্ষ ছিল এখন কি অসীম-ও তাকে এমনি করে বাধা দোব ?

ইচ্ছায় নয়, অনিচ্ছায়, অসীমের কথা তাকে বারবার ভাবতে হবে ? আর ভাবতে গিয়ে সেই নামটার সঙ্গে মুখখানার কথা-ও মনে পড়বে ? মুখখানা-র প্রতিটি রেখা ? প্রতিটি খুঁটিনাটি ?

মা কিছু বুঝতে পারেন না। শুধু শোনেন, তারা নতুন লোক খুঁজছে। বি. এ. পাস লোক চায়। সুজাতাকে তাদের দরকার ই। বলেন—তবু ওরা ভালো। তোকে দু'মাসের মাইনে দিয়েছে।

সুজাতা নিজেকে নিয়ে আর পারে না। অসীমকে দেখলো আর কি যে হলো তার। কেন অমন সব কথা বললো। সতীদি না জানি কত দুঃখ পেয়েছেন। আর অসীম ? অসীম কি বোঝেনি যে তাকে দেখেই অমন করলো সুজাতা। আর অমন কাজটা হাতে করে নষ্ট করে আসার কারণটা যদি শোনে তাকে ক্ষমা করবে কে ? বিরক্ত হবে না ? অসন্তুষ্ট হবে না ? কাকে কি বোঝাবে সে ? নিজের কাছে সে যে নিজেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। নিজেকে নিয়ে যেন আর পারছে না সে।

এবার সুজাতা আরো দুঃসাহসিক হয়। বিনীতা বলেছে, অন্য অনেকে বলেছে, সে নাকি দেখতে শুনতে ভালো। সুজাতা ভাবে, দেখাই যাক না অফিস পাড়ায় ঘুরে ? কাজকর্মের তো কত রকম হয়েছে আজকাল। রিসেপ্সনিস্ট, সেল্স্-ইন-চার্জ, আরো কত কি।

সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে সুজাতা। কলেজের সামান্য পরিচিত এক পাঞ্জাবী মেয়ে নীনা কাপুর। নীনার চুলে পোনিটেইল বাঁধা। নাইলনের শাড়ি আবরণের চেয়ে আভরণ বেশি। ঠোঁটে টুকটুকে লাল রং। নীনা কাজ করে কোন্ বিদেশী বিমান অফিসে। সুজাতাকে

সে আলাপ করিয়ে দেয় এর তার সঙ্গে। সুজাতা এবার দিনমান খেটে একশো দেড়শো নয় তিন চারশো টাকার চাকরির স্বপ্ন দেখে। নীনার কথামতো এখানে সেখানে ঘোরে। নীনাকে এসে বলে—নীনা, মিঃ শেঠিয়া আর আগরওয়ালা বলেছেন নতুন একটা ফার্ম খুলবেন। বলছেন ওঁদের সঙ্গে ক'দিন ঘুরে কাজ শিখতে। ওঁদের রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তো। বলছেন, তিনশো টাকা মাইনে হবে। তুমি কি বলো?

—শেঠিয়া আর আগরওয়ালা?

নীনা কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে—সুজাতা, তোমাকে দেখছি তো বছর দুয়েক। তুমি বড্ড ভালো মেয়ে। লেখাপড়া করবার টাইপ। তুমি কিছুতেই এসব লোকের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারবে না। তুমি চিনতে পারবে না এদের।

—বাঃ, তুমিও তো করেছো কাজ ওদের সঙ্গে?

—করেছি। কিন্তু সুজাতা আমি অনেক শক্ত মেয়ে। আমি নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানি। তুমি পারবে কি? আমার ভয় হয়।

—নীনা, আমার যে কাজটা ভীষণ দরকার।

—আমি তোমায় কথা দিচ্ছি সুজাতা, আর পনেরো দিন অপেক্ষা করো। শোনো, হিন্দুস্থান ট্রেডার্স কতবড় ফার্ম জানো তো? ওরা অনেকগুলি মেয়ে নেবে। ওদের সাবান, বেবিফুড, ভেজিটেবল অয়েল, টুথপেস্ট, ওয়াশিং মেশিন, সব কিছুর বিরাট এজেন্সি আছে। ওরা মেয়েদের বাড়ি ঘুরে ওদের জিনিস পরিচিত করতে পাঠাবে। মাসে সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে হবে। কাজটা সাময়িক, তিন মাসের জন্যে। আবার নেবে, আবার নেবে।

—নীনা, সাড়ে তিনশো টাকা?

—শোনো, আমার বন্ধু যে ছেলেটি, প্রকাশ—যাকে আমি

করবো—সেই ওখানে ভাল কাজ করে। আমার দিদি শীলাকেও ওখানে প্রকাশই কাজ দিয়েছে। এ কাজটা তোমার হবে।

—কিন্তু আগরওয়ালা যে বলছেন, অন্ততঃ দিন দশেক কাজ করতে ?

—ঘুরে দেখতে পারো। তবে সাবধান, ওদের বেশি বিশ্বাস কোর না। ওরা পঞ্চাশ একশো টাকা ফেলে দিতে পারে যখন তখন। কিন্তু মেয়েদের সুনামটা অমন যখন তখন ফিরে পাওয়া যায় না। জানলে ?

সুজাতার দুঃখ মাখানো মুখশ্রী, রুক্ষ কেশ, সস্তা চটি আর হাতে -কাচা ছাপা শাড়ির পোশাক দেখে নীনার বুঝতে বাকি থাকে না, এ মেয়ে কতখানি অনভিজ্ঞ। সে আবার বলে—আমি এ বিষয়ে তোমাকে কথাই দিলাম। বুঝছো।

সেই আশা থাকে মনে। আর ম্যাডান স্ট্রিটের বাড়ির ছয়তলার অফিসে বসে আগরওয়ালা, শেঠিয়া আর সত্যবাবু সুজাতাকে নানারকম কাজের কথা বলে। একবার টেলিফোন করে, গাড়ি করে ঘুরে আসে কোথাও! বলে—আপনার মতো আরো দু'একজনকে আনুন না! বেশ ভালো হবে।

কি যে হবে আর কি ধরণের কাজ যে হবে সে বিষয় সুজাতা কিছু বোঝেনা। নিঃশব্দ কাঁচের ঘরে, রিভলভিং চেয়ারে কর্ডের ট্রাউজার পরে বসে থাকে আগরওয়ালা। ফোন করে ঘনঘন। পঞ্চাশ হাজার বা একলাখ টাকার লেনদেন নিয়ে কথা বলে। শেয়ার মার্কেটে ছাঁট লোহার দাম উঠলো না নামলো, তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

দেখে শুনে সুজাতার মনে হচ্ছে যে এখানে অনেক বড় কিছু ব্যাপার হবে। সে হয়তো কাজ পাবে এমন একটা যা দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে।

শেঠিয়া আর সত্যবাবু শুধু বড় বড় কথা বলে সুজাতাকে। বম্বে-তে তাদের ব্র্যাঞ্চ খোলা হবে সেখানে কি যেতে পারবে সুজাতা? আচ্ছা গোড়ার দিকে না হয় কলকাতার অফিসেই থাকুক সে।

কোথায় অফিস আর কেমনকরে যে তাতে থাকবে সুজাতা—তা সে ভেবে পায় না। তবু অনেক বড় বড় লাভের আশায় মনটা তার দোলা খায়।

ঘোরাঘুরির জন্য ইতিমধ্যেই একশো টাকা দিয়েছে সুজাতাকে। বলেছে—পরশু দিন যাব আমার বন্ধুর অফিসে। দেখবেন ওদের কতবড় অফিস। চাই কি ওখানেও কাজ হতে পারে আপনার। টাইপিং শিখে নেবেন। কি আছে!

যা যা শোনে, সুজাতার মনে যে একটু একটু ভয় হয় না, তা নয়। তবে সে ভাবে এদের এত অফিস, এত ব্যবসা, এরা নিশ্চয় আমাকে ঠকাবে না।

মা তাকে বলেন—ঘরে বসে বি. এ. পড়ে পাস কর। চাকরি করবি এখন।

রাখল বলে—তুমি কোথায় কোথায় ঘোরো সুজাতা? কোথায় এম্প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জে কার্ডটা নতুন করাতে গেলে না তো?

মা বা রাখালদার কথা সব সময় সুজাতার ভালো লাগে না। সে বলে—বি. এ. পড়া আর আমার হবে না। একবার বাধা পড়লে আর কি হয়? রাখালকে বলে—কি হবে রাখালদা, কত লক্ষ কত হাজারের মধ্যে একজন হয়ে?

রাখাল বলে—তুমি যেন সস্তায় বাজি মাৎ করবার চেষ্টায় আছ সুজাতা?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ সোনার হরিণ ধরতে চাইছো। চট করে টাকা পয়সা করে ফেলতে চাইছো।

—তাই কি? তা যদি চাইতাম, তবে…

অজান্তেই সুজাতার গলায় একটা রুক্ষ সুর লাগে। সে বলে—তবে এসেছিলো তো সোনার হরিণ, অসীম মৈত্র! তাকে তো কই চেপে ধরিনি?

অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে যায় রাখাল।

সুজাতা যে কি করছে না করছে, কারুকে বলে না। ভাবে যদি আগরওয়ালার সেই বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়, তবে চেপে ধরবো। বলবো আমার অবস্থার কথা। বলবো যে চাকরি একটা দিতেই হবে আমাকে।

হয়েও যেতে পারে।

অনমনীয় অবাধ্য একটি মেয়ের কথা মনে করতে চায় না অসীম। তবু তার কথা মনে পড়ে বারবার। নিজের মনটাই কি কম অবাধ্য হয়েছে? কাজ করতে করতে, অথবা বাড়ীতে বসে অথবা এমনিই রাস্তায় ঘুরতে ফিরতে মনে পড়ে, স্কুলের সে ঘরটা রোদে যত না গরম হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তপ্ত দেখাচ্ছে সুজাতাকে। অন্যায় করছে জেনেশুনে-ও বাচ্চারা যেমন অবাধ্যতা দেখায় জেদ করে—সুজাতার মুখেচোখে-ও তেমনই এক অবাধ্যতা ছিলো।

ইচ্ছে হয়, একবার, মনের সবগুলি বাধা পেরিয়ে চলে যায় ঐ বাড়ীটায়। সুজাতাকে তার মায়ের সামনে বসিয়ে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—কি হয়েছিলো সেদিন? ঘাড়ে ভূত চেপেছিল? কে বলেছিলো ঐ রকম রুক্ষ জবাব দিতে?

অসীম জানে তা সে কোনদিন-ও পারবে না। কোন লাভ

নেই। অসীম এ-ও বুঝেছে, যে বড় নিষ্ঠুর হতে পারে সুজাতা প্রয়োজনে। ঐ সুন্দর চেহারাটার আড়ালে একটা অবাধ্য ঘাড়-বাঁকানো মন আছে।

তার কথা আর মনে করবার প্রয়োজন কি? তবু মনে পড়ে। মনে পড়ে ঈষৎ রুক্ষচুলে সামনে বেণী টানা মুখখানা—মনে পড়ে মুখেচোখে ক্লান্তির ছাপ লেখা বিষণ্ণ চেহারা—সঙ্গে সঙ্গে-ই মনে পড়ে দীপ্ত দুই চোখে কেমন করে সহসা ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে।

সুজাতার এই অবাধ্য ব্যবহারের কথা অসীম অঞ্জনাকে বলেছে। শুনে অঞ্জনা বলেছে

—আমি কিন্তু তার কোন দোষ দেখতে পেলাম না অসীম।

—দোষ দেখতে পেলে না?

—না। বরং ভালোই লাগল। মেয়েটি বোধহয় বেশ ভালো ধরণের।

—কি জানি!

অঞ্জনা অসীমের কাছে সুজাতার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে। অসীম আশ্চর্য হয়ে দেখেছে, যে সে সুজাতার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে অঞ্জনাকে। এত স্বপ্ন দেখায় তার সম্পর্কে এতগুলি বলবার কথা কেমন করে খুঁজে পেল অসীম? অঞ্জনা সে বিষয়ে কোন সকৌতুক প্রশ্ন করেনি। শুধু বলেছে

—সম্ভব নয়। নইলে একদিন আলাপ করতাম।

—যেওনা যেন,

অসীম বলেছে

—গেলে পরে হয়তো তোমাকে অপমান করে-ই তাড়িয়ে দেবে। তুমি ত' আমারই পিসী।

মনের মধ্যে যার কথা কারণে অকারণে নিরন্তর ঘোরাফেরা

করে, তাকে যদি সহসা দেখা যায়, কেমন লাগে? সন্ধ্যাবেলা চৌরঙ্গীতে গ্র্যাণ্ডহোটেলের আর্কেড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অসীম সেদিন সুজাতাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল দূরে। চট্ করে বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন একটা বেয়াড়া তালে লাফিয়ে উঠেই থেমে গেল। সুজাতা যেন অপেক্ষা করছে কার জন্যে। দূর থেকে বুঝতে ভুল হয় না, যে ক্লান্ত হয়েছে সুজাতা। দুই কাঁধ নেমে গিয়েছে—এমনিই আছে দাঁড়িয়ে। চেয়ে চেয়ে অসীমের মনে হয় এতবড় জনতা ও কোলাহলের কোন অস্তিত্ব নেই। সবগুলো মেঘ মিথ্যা হয়ে গিয়েছে—সত্যি শুধু একটি ক্লান্ত মেয়ের ছবি।

সামনে একটা ট্যাক্সি থামে। দুইজন ভদ্রলোক নামেন। সুজাতা তাঁদের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর তারা তিনজন-ই ঢুকে যায় নীরা-তে।

আর দাঁড়িয়ে থাকবার কোন মানে হয় না। অসীম-ও চলতে সুরু করে। তবু তার মনে হয়, ট্যাক্সি থেকে লোক নামছে, তাদের সঙ্গে রাত সাড়ে সাতটায় সুজাতা নীরা-তে যায় কেন? সেখানে কোন্ কাজ?

একটা কথা সুজাতা জানে না। সুজাতার মা-র সহযোগিতা সে পেয়েছে। স্কুলে সে ঘটনার পর সহসা তার দেখা হয়েছিলো সুজাতার মা-র সঙ্গে। যাদবপুর যাবেন বলে বাসরুটে দাঁড়িয়েছিলেন মহিলা দুপুর রোদে। ছেলেটি ছিলো পাশে। সুজাতার মুখখানা তার মায়েরই ছাঁচে। আর ভাইবোন দু'জনেরই দীর্ঘপক্ষ্ম কালো দুটি চোখ একই আদলের। অসীম গাড়িতে তুলে নিয়েছিলো তাঁদের এমন অতর্কিতে যে কিছু বলতে পারেননি মহিলা। অসীম সেদিন নিজেই বলেছিলো স্কুলের ঘটনার কথা। মায়েরও চোখে মুখে দুঃখ-দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছে। তিনি বলেছিলেন—কি করবো বলো? সুজাতার যে কি ধনুকভাঙা পণ! কি যে অসম্ভব

জেদ! ও যুক্তি বোঝে না, অন্যের কথা বোঝে না। তাই ও যা করে করুক নিজের বুদ্ধিতে, আমি বাধা দেব না।

অসীম বলেছিলো—কোথায় চলেছেন?

—যাবো যাদবপুরে। আমার নিজের দাদা আছেন। এখানে থাকতেন না, এসেছেন। আবার চলে যাবেন কাশী। আমাকে নিয়ে যেতে চান।

—আপনি যাবেন?

—মেয়ের বিয়ে হলো না, ছেলেটি তো শুধু নয়। কোথায় যাবো বাবা? দেখা করে আসি।

অসীম তাঁকে নামিয়ে দেবার সময়ে বলেছিলো—একটা অনুরোধ, আমি যে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি একথা তাঁকে বলবেন না।

—না।

অসীম চলে গেলে তার দিকে চেয়ে মা-র বুক ভরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে উঠেছিলো। এইজন্যে সুজাতা স্কুল ছেড়ে এলো? এ কি অন্ধ জেদ। এতে সুজাতার কোন শুভ হবে? কে তাকে বোঝাবে? শোক কি তাঁরও লাগেনি? তাই বলে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে কি লাভ হবে? আর সুজাতা, তুই যে কতটুকু মেয়ে। তুই কি পারিস তুই হাতে সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলে চলতে?

মা-কে অসীম যতই দেখেছে ততই তার মনে জেগেছে শ্রদ্ধা। সেদিনের কথাবার্তায় সে শ্রদ্ধা তার আরো গভীর হলো। সেই সঙ্গে মনে জাগলো এক সুগভীর হতাশা। সুজাতা যেন সত্যিই এক মরীচিকা। যত ধরতে চায় সে তত দূরে দূরে সরে যায়। এ যেন কবির সেই মণিহার।

—'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে

ছিঁড়তে গেলে লাগে এরে পরতে গেলে বাজে॥

তবে তাই হোক। বারবার চেষ্টা করে যখন সম্ভব হলো না, তখন আর চেষ্টা করে লাভ কি? সে এক পরম দুঃখের অধ্যায়। তাকে ভুলে যেতেই চেষ্টা করবে অসীম।

এবার নিজে জীবন যাত্রার ঢংটা সে পাল্টে দিতে চায়। সহসা আনন্দ, হৈ-চৈ, নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনা এরই মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়। তার ঔদাসীন্যের ফলে গোপার সঙ্গে হয়তো বিচ্ছেদ ঘটলো। তবু, বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের বান্ধবীরা আছেন কেউ কেউ। আর, এই সর্বত্রসাম্যের দিনে এমন মহিলাদেরও অভাব নেই যাঁদের হাতে সময় আছে প্রচুর, আর সে সময় কাটাবার খোরাক তাঁরা খুঁজে পান না। অসীম তার বন্ধুবান্ধবীদের মধ্যে একটা বিশেষ দলকে পরিহার করে চলতো। তারা যদিও অসীমকে চিরদিনই চেয়েছে তাদের মধ্যে। অসীম এবার সেইসব রায়, সিন্‌হা, সেন আর প্যাটেলদের সঙ্গে বেরুতে শুরু করলো। অফিসের পরই বেরিয়ে পড়ে। কারু না কারু বাড়িতে তাস ও বিয়ারের পার্টি চলে। অসীমের মতো নীতিবাগীশ ছেলে যে তাদের সঙ্গে হৈ-চৈ করছে, তাতে খুব মজা পায় বন্ধুরা। একসঙ্গে সিনেমা, চৌরঙ্গীতে ঘোরা। আর যে বিয়ার বাড়িতে খাওয়া চলে, সে বিয়ার বাইরে খেলেই বা দোষ কি?

অসীম বলে—কিছু নয়।

আসল কথা অসীম বলে না। বলে না, যে এতেও সে আনন্দ পাচ্ছে না। এদেরও তার বিশ্রী লাগছে। বিস্বাদ লাগছে মুখে সোমরস। বলে না, যে জীবনটাই তার কাছে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। বলে না, যে একটি মেয়ে, যার চোখে দীপ্ত তেজ, যার চেহারা সুশ্রী সুন্দর, এই একটি মেয়ে তার জীবনটা বিস্বাদ করে দিয়েছে। কিছু ভালো লাগছে না তার।

সুরেশ একটু ভুরু কুঁচকে দেখেন, কিছু বলেন না।

সুষমা এসে তাঁর কাছে নানাভাবে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন—গোপার পাত্রের অভাব হবে না। কিন্তু জামাইবাবু আপনি খোকার বিয়ে দিন। আপনি তো জানেন না, ছেলে আপনার কি পরিমাণ বারমুখো হয়ে গিয়েছে।

—জানি, সব জানি, কিন্তু কি জানলে সুষমা! জোর করাটা ঠিক নয়। আর খোকা আমাব তেমন ছেলে নয়। অন্যায় ও কিছু করতে পারে না।

সুষমা একথা শুনে সন্তুষ্ট হন নি। কিন্তু সুরেশ আর কি-ই বা করতে পারেন? সেদিন শুধু বলেছিলেন—কি করছো খোকা? ঠিক করছো তো? কি সব স্টাফ খাচ্ছ?

—কিছু না বাবা। দু'দিন একটু দলে প'ড়ে। আমার ভালো লাগে না তো! আমি খাই কোথায়? এ-ও ছেড়ে দেবো, দেখো।

আর কিছু বলেননি সুরেশ।

আজ আর অসীমের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হুল্লোড় ভাল লাগলো না। ঘাড় গুঁজে কাজ করলো রাত আটটা সাড়ে আটটা অবধি। তারপর বেরিয়ে এসে কি মনে করে গাড়িটা ছেড়ে দিলো ড্রাইভারের সঙ্গে; হাঁটতে লাগলো চৌরঙ্গীর ফুটপাত ধরে। নীল ও সাদা নিয়ন আলোতে লোভনীয় হাতছানি। মনে হলো—ঢুকি তো! বসা যাবে খানিকক্ষণ। কি হবে বাড়ি ফিরে?

ঢুকে এমনিই বসে আছে অসীম। গ্লাসটা সামনে রয়েছে। ছোঁয়নি পর্যন্ত। মেয়েরা পর্যন্ত আসতে শুরু করেছে এখানে। দেওয়াল-ভর্তি আয়না। আয়নাতে মানুষগুলির ছায়া পড়েছে। সেকালে বাদশারা বানাতেন শীশমহল। এরাও বানিয়েছে। এরাই তো এ যুগের বাদশা! তবে শীশমহলে এখন সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার, আর নর্তকী বলতে ঐ সব মেয়েরা। ঐ একজন

বাঙালিনী চলেছেন। বুঝি বা স্বামীর সঙ্গেই। এইসব জায়গায় ঢুকতে রুচি হয়।

· আবোলতাবোল ভাবছে অসীম, সহসা চোখটা তার আটকে গেল একটা প্রতিচ্ছবির ওপর। দেওয়ালের আয়নায় ছায়া পড়েছে। তাই সে দেখতে পাচ্ছে। ও কার ছায়া? তিনটি মানুষ। দুইজন দুই পাশে আর মাঝখানে বসে সুজাতা। সুজাতা? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সুজাতা। কোনও ভুল নেই। সেই হাল্কা নীল শাড়ি, আর হাল্কা নীল জামা। যে ক-দিন সে দেখেছে সুজাতাকে, ঐ একই পোশাকে দেখেছে। এখন সারাদিনের ক্লান্তিতে শ্রান্ত মুখ, খোঁপাটা ঝুলে পড়েছে ঘাড়ে। মুখ, কপাল ঘামে চিকচিক করছে।

কি করছে সুজাতা? খুব মন দিয়ে অসীম দেখে। লোক দুটি অবাঙালী সন্দেহ নেই। একজনের কানে হীরে চিকচিক করছে। দু'জনেই মদ খেয়েছে। অন্ততঃ ফর্সা মোটা লোকটার মুখ দেখে বুঝতে বাকি থাকে না যে, সে খুব প্রকৃতিস্থ নেই। মাথাটা ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে, আর সে কি যেন বলছে সুজাতাকে। সুজাতা দু'দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। বিব্রত, অসহায় দৃষ্টি সুজাতা বিপন্নভাবে একবার চেয়ার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করে, আবার লোকটা তার হাতে হাত রাখে। বসতে বলে। সুজাতা ঘাড় নাড়ছে।

অসীম লাফিয়ে ওঠে চেয়ার ঠেলে দিয়ে। এ টেবিল ও টেবিলের আরোহীদের ঠেলে দিয়ে সে পা ফেলে ফেলে চলে যায়। ঝুঁকে পড়ে ফর্সা লোকটার হাত সরিয়ে দেয়। বলে—আপনি, এখানে?

সুজাতার ঠোঁট ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বলে—এই লোকটা আমাকে কাজের কথা বলে এখানে এনেছে···বলে এখানে কার যেন আসবার কথা আছে····আমি বুঝতে পারিনি····

কালো লোকটা বলে—লেডি, তুমি টাকা নিয়েছো, আবার পালাচ্ছো? অ্যাঁ?

অসীম তার মুখে ঘুসি মারে। অসীমের হাত আর লোকটার চোয়ালে ঠোকাঠুকি হয়ে বিশ্রী একটা শব্দ হয়! তারপর ফর্সা লোকটা তাকে মারে কাঁধের ওপর বেতালা একটা ধাক্কা। বলে—তুমি কে হে মিস্টার? কি ভেবেছো নিজেকে?

সুজাতা বলে—আপনি ওদের সঙ্গে মারামারি করবেন না।

তার কথা কে শোনে? টেবিল উলটে পড়ে, কাঁচের গ্লাস টেবিলের সঙ্গে সঙ্গে পড়ে মেঝেতে। গ্লাস বোতলের ভাঙা কাঁচে ছড়াছড়ি। অসীমের হাতের দু'একটা ঘা পড়তেই চৈতন্য ফিরে আসে দু'জনের। তারা মুখে রুমাল চেপে মিস্টার মিস্টার করে। ছুটে আসে ম্যানেজার। অসীমের প্রথম দুশ্চিন্তা হয় সুজাতা কোথায়? পেছন ফিরে আর সুজাতাকে দেখে না। মনে হয় কোন পলাতক বুঝি কাঁচের দরজার ওপাশ দিয়ে চলে গেল বিদ্যুৎগতিতে।

সমস্ত ঘরেই একটা তোলপাড় জেগেছে। ম্যানেজার এসেছেন ছুটে। ব্যাপার দেখে তিনি দু'পক্ষকেই থামাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিক উৎসাহী কেউ গিয়ে ইতিমধ্যে পুলিসকে খবর দিয়ে থাকবেন। এসে পড়েন শান্তিরক্ষক দল। সসম্মানে নিয়ে চলে যান অসীমকে তার দু'জন সঙ্গীসহ থানায়। ম্যানেজার-কেও সঙ্গে যেতে হয়।

অসীম ও. সি.-কে বলে—স্যার, আমাকে মিছে বিরক্ত করবেন না। এরা দু'জন মাতাল একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করেছিল, আমি বাধা দিয়েছি।

—বেশ করেছেন।

—তবে?

—তবে একরাত্তির অতিথি থাকুন।

—একটা ফোন করতে পারি কি?

—করবেন?

হ্যাঁ। বিশ্বাস করাতে হবে তো আপনাকে, যে অভদ্রজনোচিত কোনো আচরণ আমি করিনি।

—তো করুন ফোন!

ফোন করে অসীম সুরেশকে বলে—ছুটো মাতাল ঠেঙিয়ে ধরমতলা থানায় এসেছি। নিয়ে যাও তো!

—দাঁড়াও আসছি।

হতদন্ত হয়ে আসেন সুরেশ। বলেন—অমনি হুজ্জুতি বাঁধিয়ে বসে আছ? যা ভেবেছি!

ও. সি.-কে বুঝিয়ে শুনিয়ে জামিন দিয়ে খালাস করে আনেন সুরেশ ছেলেকে।

এখন উত্তেজনাটা কেটে গিয়েছে, নিজেকে শৈশবের সেই বাধ্য ছেলের মতোই মনে হয় অসীমের। বাপের পেছন পেছন নামে গিয়ে পার্ক স্ট্রিটের চীনে দোকানে। সুরেশ বলেন—বলি, খাদ্য কিছু খেয়েছ?

—না।

—তো খাও।

খাবারগুলো সামনে দেখে তবে অসীম বুঝতে পারে যেন, যে তার ক্ষিদে পেয়েছিলো। খেতে শুরু করে অসীম। বলে—কি হলো জানো? শুনবে তো?

—কাল শুনবো। এখন বাড়ি যাবে। জামাকাপড় বদলাবে, ঘুমুবে। একটা কথাও নয়।

সকালবেলা সুরেশকে আজ অত্যন্ত কর্মব্যস্ত দেখা যায়। সাতসকালেই দাড়ি কামিয়ে চা-এর সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হয়ে বসেছেন। অসীমের দিকে তাকান। ছেলের সুশ্রী মুখখানায় দাড়ি গজিয়েছে এক ঝাঁক। বোধহয় এ ক'দিন দাড়ি কামায়নি। এমন কেন হলো? ও তো এমন করে না? মায়াও হয়। বয়সই হয়েছে। ছেলেমানুষিগুলো কমেনি। এক এক সময় এতবড় ছেলেকে এমন অসহায় লাগে। বকবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন কি মনটা তাঁর গলতে শুরু করে। চিরকাল একরকম! একবার শৈশবে ঘুড়ির নেশায় অসীম তেতলার ছাদ থেকে পাশের বাড়ি ছাদে টপকে গিয়েছিলো। দুষ্টুমি যদি প্রাণঘাতী হয় তবে তাকে শাসন করাই উচিত। এই মনে করে তিনি শাসন করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বসেছিলেন। অসীম বার দুয়েক তাকালো তাঁর দিকে। তারপর হঠাৎ কাছে এসে হাঁটুতে হাত রেখে বললো—জানো বাবা, ঘুড়ির পেছনে আমি মোটেই ছুটতে চাই না। তোমার আর মা-র কথা আমার খুবই মনে পড়ে। কিন্তু লাল নীল ঘুড়িগুলো এমন চমৎকার! দেখে দেখে আমি যেন সব ভুলে যাই। জানো বাবা, আমি যে গেয়েছিলুম না, সে ঐ ভুলে ভুলে। ইচ্ছে করে নয়।

সে কথা শুনতেই মনটা ভীষণ মায়ায় ভরে গিয়েছিলো সুরেশের। তিনি বলেছিলেন, একটা খুব কড়া গলায়—খোকা, আমি কালকেই তোমাকে দু'টাকার ঘুড়ি লাটাই কিনে দোব। তুমি কিন্তু পার্কে গিয়ে ওড়াবে। কোন কারণেই ছাদে যাবে না।

অসীম বেরিয়ে গেলে পরে লক্ষ্মী বলেছিলেন—হলো শাসন! এমন মানুষ দেখিনি! এখন ছেলেটা বাঁচুক বা মরুক, কেমন?

—আহা, ঘুড়ি ওড়ালেই যদি মানুষ মরতো! তুমি কি সব বাজে কথা বলো।

এখনও অসীমের দিকে চেয়ে চেয়ে সুরেশের সেই রকম মনে হলো, যেন মায়া পড়লো। তিনি বলেন—খোকা।

—বাবা!

—ব্যাপার কি বল তো?

—কি ব্যাপার?

—আমি ঠিকই বুঝি! তুই বল্?

কি বলছো?

—তোমার কি হয়েছে বল তো? এই দেখলাম দিব্যি আছো। আবার দেখলাম মনটা খারাপ করে রয়েছো। স্কুলে গেলে, কি যে হলো সেখানে, কিছুই বুঝলাম না। আবার এদিকে দেখছি কোন মেয়েকে কে অপমান করলো তাই নিয়ে তুমি মারামারি করে থানায় যাচ্ছো! ব্যাপার কি খোকা?

একটু চুপ করে থাকে অসীম। মুখখানা লাল হয় আস্তে আস্তে। বলে—বলবো?

—বল।

—এ সেই বিনয় গাঙ্গুলীর মেয়ে। এর নাম সুজাতা। আই. এ. পাস করেছে, বি. এ. পড়ছিল···

অসীম বলে চলে সব কথা। বলে—ঘটনা কিছুই না। তবে মেয়েটি বড্ড জেদী। ব্যক্তিত্ব ভালো, কিন্তু আত্মবিশ্বাস যদি অন্ধ করে ফেলে, তবে তো বিপদ হবেই। এই ধরো কাল যা হলো।

সব শোনেন সুরেশ চোখ বুজে! বলেন—বুঝলাম! তা, তুমি কি চাও যে আমি কিছু একটা করি?

—কি করবে?

—তাও তো বটে! মেয়ে যদি এমন আত্মাভিমানী হয়, তবে তাকে সাহায্য করাও মুশকিল। অথচ কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে এখন তার সাহায্যই প্রয়োজন। ছেলেটি কোথায় পড়ে? কি নাম?

—পড়ে কোথাও! ভাল নাম তো জানি না।

—তা খোকা, অফিস না হয় ক'দিন সুধীন, আয়ার, ওরাই চালাক। তুমি ক'দিন পুরীতে যাবে? ঘুরে এলে ভালো লাগবে তোমার।

—না। বাইরে যেতে এখন ইচ্ছে নেই।

বাবাকে সব বলে খুব হাল্কা লাগে অসীমের। সুরেশ বলেন —যাই হোক, তোমার চেহারাটাও খারাপ হয়েছে। একটু নজর দাও।

হ্যাঁ। আর কাজকর্ম গুছিয়ে নিই। চলো আমি তুমি দু'জনেই যাবো। কেমন?

—সেই হাজারীবাগের মেয়েটির কাকা আজ আসবেন। তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে খোকা। ছবি তো দেখেছো?

অসীম কাগজে চোখ রেখেই বলে—না। আর কি হবে বাবা ছবি দেখে? মা-র হাতে পাতা ঘর গেরস্তালী, কে না কে এসে বসবে। তোমার স্কুল, তোমার কাজকর্মে আনন্দ খুঁজে পাবে না, আমিও শান্তি পাব না। থাক না। এই তো আমি তুমি বেশ আছি। যা থাকবে ঐ স্কুলে দিয়ে দেবো।

সুরেশ আর কথা বলেন না। অনুসন্ধানী নজরে দেখতে চেষ্টা করেন ছেলের মুখ। তারপর ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান। লক্ষ্মীকে কথা দিয়েছিলেন, যে পিতা মাতা দুই-ই ছেলের। তা হতে পারলেন কি? বাপ হয়ে জেরা করে মুখের স্বীকারোক্তি শুনলেন। কিন্তু মা হয়ে অন্তরের কথা শোনা—তা পারলেন কি?

॥ নয় ॥

যে তীর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাকে ফিরিয়ে আনা বড় কঠিন।

অবস্থার যে ধারাবাহিকতা সুজাতা নিজে সৃষ্টি করেছে, তাকে পরিবর্তিত করাও তেমনি কঠিন।

সেদিনকার ঘটনার কথা সুজাতা নিজেই বলেছে মা-কে। নীনা এসেছে তাদের বাড়ি। নীনাও তাকে তিরস্কার করেছে। বলেছে —আগে তোমাকে বলিনি? যে এ সব মানুষকে চেনা যায় না? আমি জানি না, ওরা কি করে? ঐ সে সত্যবাবুকে দেখছো না? ও ভালো ভালো সব মেয়েদের নিয়ে যায়। এ কাজ সে কাজের ভাঁওতা দিয়ে এই সব লোকের কাছে ভিড়িয়ে দেয়। আমার চোখের সামনে কতগুলো মেয়েকে দেখলাম এই করে নষ্ট হয়ে যেতে। আমাকে যদি একবার বলতে?

সুজাতা জবাব দিতে পারেনি। মাথা নীচু করে থেকেছে।

মা রাতে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন—তোর বড়মাকে তো জানিস্? ইস্কুলে কাজ করেন। তবে যতই সন্ন্যাসী মানুষ হোন, দাদা আমাকে চিরদিনই ভালবাসেন। আমার ছাড়া তো তাঁর কেউ নেই। আর আমাদের বা কে আছে বল্? দাদা বলছেন, আমাদের এখানকার পাট তুলে দিয়ে কাশী যেতে। অতবড় বিদ্বান মানুষ। পল্টুটা মানুষ হয়ে যাবে। আর তোর জন্যে আমি সম্বন্ধ দেখছি। তোকে আমি বিয়ে দেব। ছেলেটি মনোমত হলে···একলা একলা বাঁচা কি সোজা মা? দেখছিস না, কত দিক থেকে বিপদ আসে।

রাখাল যেন ইদানীং যাওয়া-আসা কমিয়ে দিয়েছে। রাখাল বলে—আগে বিপদে পড়তো, বা অন্য কোন প্রয়োজন হতো, সুজাতা বলতো আমায়। কিন্তু আজকাল কি কিছু বলে? কি করবো বলুন?

সুজাতা জবাব দিতে পারেনি। সব চেয়ে লজ্জার কথা হলো, অসীমের সেই সন্ধ্যার চেহারা যেন মনে বিঁধে আছে তার। ছি ছি, একি লজ্জার কথা হলো? যে অসীমকে সে এমন করে পরিহার করে চলেছে—ভাগ্যচক্রে সেই অসীমের সঙ্গেই বা তার দেখা হয় কেন? আর যে অসীমকে সে শুধু আপমানই করেছে, সেই অসীমই তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দেখে অমনি করে রুখে ওঠে কেন? বুঝতে পারে না সুজাতা। সব হিসেবে তার গোলমাল হয়ে যায়। অসীমের কথা তার ঘুরে ফিরে এখন অনেক সময় মনে হয় অসীমকে সে যা ভেবেছিলো, যে ধারণায় বসে তার কাজগুলো হয়েছিলো ঐ রকম একরোখা—সে ধারণাটার সঙ্গে অসীমের যেন মিলছে না। বরঞ্চ, সঙ্গোপনে মনের কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, যে সুজাতার মনে হচ্ছে, সে-ই যেন দোষ করেছে। সে-ই দোষী।

দোষী যদি হয় তো তার দিক থেকে এখন কি ব্যবহার হওয়া উচিত? তার কি উচিত নয়, একবার দেখা করা অসীমের সঙ্গে? নিজে থেকে গিয়ে বলা যে অন্তত সেদিন হোটেলের সে ঘটনার জন্যে সে অসীমের কাছে কৃতজ্ঞ?

কিন্তু কেমন করে যাবে? একদিন যেমন করে গিয়েছিল চেক ফেরৎ দিতে? ভাবতেই সুজাতা একলা একলাই লজ্জায় লাল হয়ে যায়। তা সে পারবে না। এর আগে হলে-ও হতো। এখন যে লোকটার কথা তার দিন নেই, রাত নেই, কত সময় মনে হয়—তার সামনে গিয়ে ধন্যবাদ দেওয়া?

সুজাতা বোলে যে সে হেরে যাচ্ছে নিজের কাছে।

ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতোই সে এই সময় পেয়ে যায় সেই কাজটা। সেই দোরে দোরে ঘুরে এটা সেটা বিক্রী করবার কাজ। ডালহৌসীতে গিয়ে কাজটা বুঝে নেবার সময় তার এমন কথাও মনে হয়েছে, যে একটু ঘুরে গেলেই যদি মিশন রো-তে যেতে পারে, তবে অসীমের সঙ্গে সহসা দেখা হওয়াও বিচিত্র নয়। একদিন প্রয়োজন মনে করতে দেখা করেছিলো। আজ ধন্যবাদ জানাবার জন্য দেখা করা উচিত নয় ?

মন ঠিক করতে পারে না সুজাতা। নীনা তার কথা রেখেছে। প্রথম সপ্তাহে ছয়দিনের মাইনে ষাট টাকা হাতে পেয়েছে সুজাতা। নীনারই পরামর্শে রংবাহারী সস্তার সিল্ক কিনেছে দু'খানা। চুলগুলি জড়িয়ে কাঁটায় আটকে চোখমুখের বিদ্রোহী ভাবটা সংযত করছে।

এমনি সময়ে একদিন রাখালের সঙ্গে দেখা। এক পাড়াতে পাশাপাশি বাস। তবু আজকাল তেমন ঘন ঘন দেখা হয় কই ? রাখালকে দেখে সুজাতা হাসে। বলে—রাখালদা 'নাকি অফিসার হয়েছো ?

—বলতে পারো।

—মানে ?

—মানে হলো, কথা হয়েছে রিফিউজি রিহ্যাবিলিটিশন-এ যাবার। এখনো যাইনি।

—গেলে খাওয়াবে তো ?

—আমি খাওয়ালে তুমি খাবে ?

—নিশ্চয়।

—বেশ, কথা রইল তবে। খাওয়াব একদিন

—কি দেখছ ?

—দেখছি কত বদলে গিয়েছ তুমি।

—বদলে গিয়েছি ?

—সুন্দর হয়েছো অনেক।

—ঠাট্টা করছ ?

—ঠাট্টা করিনি।

রাখালের গলার সুরে এমন কিছু থাকে, যে অপ্রস্তুত না হয়ে পারে না সুজাতা। তার চাকরিটাই যে চাকচিক্যের। নীনার দিদি শীলা বলেছে—সবসময় সুন্দর হয়ে থাকতে হবে। সে বলেছে।

—তাই বলে মুখে রং মাখতে পারব না।

—দরকার করবে না।

সুজাতা অবশ্য মমে মনে যুক্তি খুঁজতে চেয়েছে আর হতাশ হয়েছে। সে এক সপ্তাহে সাবান' অন্য সপ্তাহে পালিশ, আবার কখনো বেবিফুডবিক্রী করবে। তায় সাজগোজের সঙ্গে জিনিসগুলোর কি সম্পর্ক ?

তবু কাজটি বেশ। নতুনত্ব আছে। অফিস থেকেই ব্যাগে করে জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বেলা বারোটার সময়ে অফিসের গাড়ি এসে একটা চৌরাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যায়। আবার চারটের সময় সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বাড়িতে বাড়িতে শুধু নমুনা রেখে এলেই হবে না। আবার দেখাতে হবে ব্যবহারের পদ্ধতি।

এমনি ভাবে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতেই একদিন সুজাতা এসে উপস্থিত হয় সুরেশের বাড়িতে।

ঘড়িতে তিনটে বাজলে ভারী মুসকিল সুরেশের। সময় আর কাটিতে চায় না। এমনিই বসে আছেন, এমন সময় বিশ্বনাথ কাকে যেন সাদর অর্ভর্থনা করে ভেতরে আনে।

একটি মেয়ে। তাকে বসিয়ে তাঁর কাছে এসে বিশ্বনাথ বলে—সেই সব দিদিমণি গো! যাঁরা সব মানুষের বাড়ি বাড়ি তেল, সাবান, দাঁতের মাজন, সব বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন।

বিশ্বনাথের বলবার কায়দায় হাড় জ্বলে যায় সুরেশের। কেননা বিশ্বনাথ যে সগতোক্তি করে তা পরিষ্কারই শুনতে পায় মেয়েটি।

মেয়েটী বসেই ব্যাগ খুলতে শুরু করে। একটা লিস্ট বের করে বলে—এটা উনিশ নম্বরের বাড়ি তো?

হ্যাঁ।

—আচ্ছা! বলে সোজা হয়ে বসে, তাদের সেল্‌স্‌ অর্গানাইজার যেমনটি শিখিয়েছেন, তেমনই মিষ্টি হাসে সুজাতা। বলে—বাড়ির মেয়েদের একটু ডাকবেন?

—আমাকেই বলুন।

সুজাতা ভাবে ভদ্রলোক বোধহয় খুবই গোঁড়া। আবার বলে—আমি বিরক্ত করবো না। হিন্দুস্থান ট্রেডার্স থেকে আসছি আমি। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করবো, আর আমাদের কোম্পানির জিনিসগুলির পরিচয় দেবো। বেশি সময় লাগবে না।

বিশ্বনাথ ওপরপড়া হয়ে বলে—বাড়িতে মেয়েরা কেউ নেইকো। বাবু একলা।

—ও।

সুজাতা এবার চটপট কাজ শুরু করে। বলে—আচ্ছা, বাড়িতে আপনি কি সাবানে কাপড় কাচেন?

সুরেশ কি সাবানে কাপড় কাচেন? পেছন থেকে হয়তো বা বিশ্বনাথ হাসি মুখে শুনেছে কথাগুলো। তিনি কাপড় কাচেন? বিশ্বনাথ বোধ হয় এখনি যাবে গিয়ে অন্য চাকরদের কাছে বলবে এই অসম্ভব কথা। কিন্তু মেয়েটি কেমন করে চেয়ে আছে। জবাব তো দিতেই হয়। সুরেশ বলেন—ঐ আর কি? যখন যা হয়…

তারপর মেয়েটি ছেলেমানুষ দেখেই হোক, বা নিঃসঙ্গ মনটায় যেন মায়া হয়, সেইজন্যেই হোক, সুরেশ বেশ হেসে এগিয়ে বসেন

চেহারাটা টেনে। বলেন—আমার ঠিক কাপড়কাচার কোন আগ্রহ নেই, জানলেন?

সুজাতা তাড়াতাড়ি বলে—বাড়ির মেয়েদের কার কোন ক প্রিয়, সে সব তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের অন্য মেয়েরা আসবে অন্য সময়ে। সে তো পূজোর মুখে হবে। এখন আমরা অন্যরকম কাজে এসেছি।

—সে কি, কার কি কাজ ভালো লাগে তার আবার লিস্ট হবে নাকি? জানি না তো?

—আমাদের কোম্পানিই নতুন শুরু করলো এই ধরনের কাজ। ধরুন, এই দক্ষিণ কলকাতায় দেখা গেল মেয়েদের ঝোঁক বেশী হচ্ছে কাপড় কাচায়। অর্থাৎ বাড়ির কাজ তো আমাদের করতেই হয়? তার মধ্যেও কাজের ভালো লাগা মন্দ লাগা আছে? যদি দেখি, এদিকে মেয়েরা সিল্ক, সূতী সবই বাড়িতে কাচেন—তবে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন সাবান এখানে বিলি করবো। অল্প পরিশ্রমে কাপড় কাচাবার ওপর আমরা যে বই বের করেছি, সেটা এনে পড়ে শোনাবো।

—আচ্ছা।

কাপড়-কাচা যে এতখানি আলোচনার বস্তু হতে পারে, আর এমনি সব শিক্ষিতা ভদ্র মেয়েরা যে সেই কাজ নিয়ে ঘুরতে পারে, তা জানতেন না সুরেশ। জেনে আশ্চর্য হয়ে যান।

সুজাতা এদিক-ওদিক চেয়ে বলে—একটু জল পেতে পারি কি?

—নিশ্চয় নিশ্চয়। বিশ্বনাথকে বলেন—নিয়ে আয় একগ্লাস লেমন স্কোয়্যাশ। পাখাটা বাড়িয়ে দে। তোরা যা হচ্ছিস না!

সুজাতার বেশ লাগে এই আলাপী মানুষটিকে। সুন্দর লম্বা-চওড়া চেহারা। বেশ সরল এবং ছেলেমানুষী ভাব আছে একটা।

সারাটা দিন এ-বাড়ি ও-বাড়ি হেঁটে হেঁটে পা দু'খানা তার ক্লান্ত হয়ে গেছে। এখন এই বাড়ির সাদর অভ্যর্থনা, আর আরামের পরিবেশ তার ভালোই লাগে। মস্ত বড় ঘরখানা। ওপরে জানালার মাথায় লাল নীল কাঁচের জাফরিতে পদ্মফুল আঁকা। তার ভেতর দিয়ে রোদ আসছে রঙীন হয়ে। পুরোন ঢঙের ভারী ভারী চেয়ার, টেবিল, পিঠখাড়া সোফা, সেটি। বুক-সেল্‌ফে অনেক বাঁধানো মাসিক-পত্রিকা। দেওয়ালে কয়েকখানা অয়েল-পেন্টিং। দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি। সর্বত্র একটা আঁধার। মনে যেন বোঝে সুজাতা এ বাড়িতে মেয়ে নেই।

তারপর সে তার কাজের কথা শুরু করে। ঠিক যেমনটি শিখে এসেছে অফিসে শীলার কাছে, তেমনটি করেই বলে। বলতে শুরু করে—

এই যে সুন্দর ছোট্ট প্যাকেটটি দেখেছেন, এর মধ্যে রয়েছে সেই গুঁড়ো সাবান। এমন তাড়াতাড়ি, না আছড়িয়ে, পোশাকের ক্ষতি না করে এমন সহজে এই সাবানে কাপড় কাচা চলে যে দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। দেখতে চান? আচ্ছা, একটি বাসনে দু'সের জল আনুন। আর এক টুকরা ময়লা কাপড় আনুন।

সুরেশের খুব ভালো লাগে। উৎসাহী হয়ে ওঠেন তিনি। সংসারে নানারকম খুঁটিনাটি নতুনত্ব আনতে তিনি খুবই ভালবাসেন। বাড়িতে মানুষ নেই, কে বা সহযোগীতা করে, কে বা দেখে? একটু উৎসাহ আর সঙ্গী পেলে তিনি যে কত করতে পারেন।

এতদিন রান্না নিয়েই পরীক্ষা করেছেন। কাপড়-কাচার দিকটা তো ভাবেননি। বলেন—বিশ্বনাথ, নিয়ে আয় জল আর ময়লা কাপড়।

আবার তখনি ভয় হয়, বিশ্বনাথ বুঝি বা সাংঘাতিক ময়লা কিছু

এনে হাজির করে। বিশ্বনাথ অনেক ভেবেচিন্তে অসীমের পকেট থেকে হাতড়িয়ে গোটা ছয়েক রুমাল আনে। জলের গামলা আনে। সুজাতা বলে—এই যে, আপনি নিজে হাত দিন। তা'হলে তো বুঝবেন, জিনিসটা কেন ভালো। দিন, এই চামচের চার চামচ।

সুরেশ চার চামচ সাবানের গুঁড়ো এক গামলা জলে মেশান। সুজাতা বলে—এবার নাড়তে থাকুন!

সুরেশ নাড়তে থাকেন।

—এবার ময়লা কাপড়গুলি ওতে মেশান।

সুরেশ ছ'খানা পাতলা রুমাল সেই একগামলা সাবান জলে ভিজিয়ে দেন।

—এবার আস্তে আস্তে কচলাতে থাকুন।

সুরেশ রুমাল কচলান।

—এবার এইগুলি দু'বার, দু'বার নয় তিনবার স্বচ্ছ, ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ধুয়েছেন?

সুরেশ বলেন—বিশ্বনাথ, আমাদের স্বচ্ছ ঠাণ্ডা জল আছে তো?

—দেখি!

বিশ্বনাথ জল আনে আবার। বাইরের ঘরের মেঝে সাবান জলে পিছল হয়। ছ'খানা রুমাল কেচে তুলে সুরেশ বলেন—সত্যিই তো! চমৎকার! বাঃ, আমি ভাবতে পারিনি যে এমন পরিষ্কার হবে। তা এই সাবান যদি পাওয়া যায়, তবে আর ধোপাবাড়ি যাবার দরকার কি? এই তো দেখছি স্বাবলম্বী হবার প্রধান একটা উপায়। এর দাম কত?

—আপনি রাখবেন একটা? এক পাউণ্ড সাবান এক টাকা ছ'আনা।

—একটা! ক'টা আছে ঐ ব্যাগে?

নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না সুজাতা। বলে —বারোটা।

—বারোটাই রাখবো। বিশ্বনাথ, টাকা নিয়ে আয়।

এ রকম খদ্দের চট্ করে পাওয়া যায় নাকি? সুজাতা শুধু ভাবে, তাদের সেল্‌স্ ম্যানেজার মিস্টার রামনাথন্ কি খুশিই না হবে। কাজ দেখাতে পারলে তবে তো উন্নতি হবে তার। বারোটা প্যাকেট সে সাজিয়ে রাখে টেবিলে। একটা ছোট্ট চটি বই বের করে দেয় সুরেশকে। বলে—সূতী কাপড় কাচবার সমস্ত নিয়ম এতে লেখা আছে। বেশ পড়ে পড়ে তবে ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, আর একটা অনুরোধ, আপনার যদি এই সাবানটি ভালো লাগে, আপনি দয়া করে আপনার পরিচিত ভদ্রলোকদেরও বলবেন সেটা। কেমন?

—নিশ্চয়।

—গরম কাপড় ও রেশমী কাপড়ের জন্যে আমাদের অন্য সাবান। পরদিন সেটি নিয়ে আসবো। কেমন?

মেয়েটি চলে গেলে পরেও সুরেশের বেশ লাগে কিছুক্ষণ। বলেন—দেখ বিশ্বনাথ, দেখছিস? আজকাল কত রকম হচ্ছে। মানুষ কত ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। তোরা শুধু সেই প্রাচীন যতো সাতকেলে পুরোন সব ধরে বসে থাকবি।

নিয়মাবলী পড়েন: যদি প্রকৃষ্ট ফল চান, তবে এই সাবান ব্যবহারের জন্য আমাদের কোম্পানীর নির্মিত অ্যালকাথিনের বালতি ব্যবহার করুন। প্রমাণ মাপের বালতি মাত্র বেয়াল্লিশ টাকা।

বলেন—কালই একটা বালতি আনবি।

বিশ্বনাথ বলে—হ্যাঁ! বেয়াল্লিশ টাকার বালতিতে দেড় টাকার সাবান গুলে দু'টাকার রুমাল কাচা! যত সব বিলিতী কোম্পানির ফন্দিবাজী।

—বিলিতী কোথায়? সব এখন দেশী না?

—ওই হলো!

—আর সাবান জলের ছিটে না লাগে, সে জন্যে একটা অ্যাপ্রন···যাক্‌গে! তোদের কাছে বলেই বা কি হবে।

ওদিকে সাফল্যের আনন্দে সুজাতার পা হাল্‌কা হয়ে যায়। চৌরাস্তায় তাদের গাড়ি এসেছে। এখনো সব মেয়ে আসেনি। সুজাতার হাল্‌কা ব্যাগ দেখে নন্দিতা বলে—এ কি সুজাতা! ম্যাজিক না কি?

—ম্যাজিকই তো! সব বিক্রি করে এলাম।

—সত্যি?

—নিশ্চয়।

—তুমি খুব লাকি ভাই। আমি দেখ না, যেখানে যেখানে গেলুম মহিলারা কেউ বা চটে গেলেন ঘুম ভাঙালুম বলে। কেউ বা দাম শুনেই পিছিয়ে গেলেন। মোটে তিন প্যাকেট বিক্রি হলো আমার।

সুরেশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু সুজাতার ডিউটি পড়ে ক'টা দিন পার্ক সার্কস, এণ্টালীতে। আসতে পারে না সুজাতা। একজন উৎসাহী সঙ্গীর অভাবে সুরেশের কাপড় কেচে স্বাবলম্বী হবার উৎসাহটা স্বভাবতই ঝিমিয়ে আসে। এমনি সময়ে একদিন সুজাতা আবার এসে উপস্থিত হয়।

খুব খুশি হয়ে ওঠেন সুরেশ। বলেন—আসুন, আসুন! কই আপনি তো আর এলেন না?

—এবার আমাদের নতুন জিনিস এনেছি। হোম-পালিশ। এটা কেমন জিনিস জানেন? অ্যাসট্রে, রেকাবি, রুপোর জিনিস, তামা, পেতল, নিকেল, সব কিছু পালিশ করা চলবে এই পালিশ দিয়ে। এমন চমৎকার। একটা ময়লা কিছু আনুন। আচ্ছা আমি এমননিই দেখাচ্ছি।

বুক-সেল্‌ফের পেতলের হাতল, দরজায় পেতলের কড়া। একটা কাপড়ের টুকরোয় পালিশ লাগিয়ে ঝকঝকে করে বেড়ায় সুজাতা সব কিছু। আর ম্যাজিকের মতোই, যেন কোনো মায়াপরীর স্পর্শ পেয়ে ঝকঝকে হয়ে ওঠে জিনিসগুলি। ঘুরে ঘুরে অ্যাস্‌ট্রে, পিতলের হাতী, ঘোড়া, হরিণ, সবগুলি ঘষে ঘষে দেখায় সুজাতা। সুরেশ জিনিসগুলি দেখেন না, মানুষটিকে দেখেন। দেখেন, সুশ্রী ঈষৎ যেন ক্লান্ত মলিন চেহারা। দেখেন দুটি কর্ম-নিপুণ হাত। গলার স্বরটি ঈষৎ ভারি, শুনতে মধুর। দেখেন, কাঁধে পুরোন একটা চামড়ার ব্যাগ, পায়ে পুরোন চটি। সে চটিতে ধূলা মাখা। দেখে দেখে কেমন যেন মায়া হয়। কাজ করে, আর মুখস্ত কথাগুলি আউড়ে চলে সুজাতা।

—প্রথমে সামান্য পালিশ লাগিয়ে নিন কাপড়ে। তারপর যে জিনিসটি পরিষ্কার করতে চান, সেটির ওপরেও মাখান তারপর আরো একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঘষে ফেলুন। দেখুন, চমৎকার জ্বলজ্বল করছে না? এও আমাদের হিন্দুস্থান ট্রেডার্সেরই জিনিস। আপনি এই নমুনা দেখলেন তো? আপনি ভেবে দেখতে পারেন, যে এটি ব্যবহার করবেন কি না? অথবা, এক কৌটো কিনেও দেখতে পারেন। যা আপনার খুশি।

গলার স্বরটাও যেন বড্ড ক্লান্ত। সুরেশ বলেন—ক'টা আছে ব্যাগে?

—দশটা। একটার দাম এক টাকা চার আনা।

—আমি না হয় দশটাই রাখব।

—রাখবেন? কৃতজ্ঞতার হাসিতে মুখ ভরে যায় সুজাতার। বলে—রাখবেন?

—নিশ্চয়! কি জানো মা ··

অজানাতেই সুরেশ তুমি বলেছেন। বলেন—কি জানো মা····

বাড়িটা তো নেহাৎ ছোট নয়। কত দরজা, কত পেতলের হাতল, আর কত রকম জিনিস! সবগুলোতে পালিশ লাগাতে হলে কতগুলো পালিশের কৌটো দরকার তা বোঝ?

কি করে বুঝবে সুজাতা? তার ছু'খানা ছোট ঘরে থাকা অভ্যাস। তাদের বাড়িতে অ্যালুমিনিয়মের বাসনে রান্না হয়। কলাইকরা থালায় খাওয়া হয়। পেতলের ছোট একটি কড়াই আছে। তাতে তার মা মাসের গোড়ার দিকে কোন দিন বা তাকে আর পলটুকে লুচি ভেজে দেন। পালিশ বা গুঁড়ো সাবান সংসারে কোন কাজে লাগবে?

সে একটু হাসে। সুরেশ বলেন—এখন আমার চা খাবার সময় হলো। একটু চা খাবে আমার সঙ্গে?

আগরওয়ালাদের ব্যাপারের পর থেকে নতুন নতুন মানুষ সম্পর্কে খুবই সচেতন হয়েছে সুজাতা। চট করে সে মেশে না কারু সঙ্গে। তবু এই প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, স্নেহশীল বৃদ্ধটীকে তার ভালো লেগেছে। সে বলে—একটু খেলে হয়। দেরি হবে না তো?

—না না।

সুরেশ চা নয়, চা-এর সঙ্গে সঙ্গে একটি মাখন, কলা আর সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়েন না। গল্পে গল্পে সময় কাটিয়ে দেন। বাইরে ভাদ্রমাসের আকাশ যে কালো হয়ে আসছে, সে খেয়াল থাকে না। বাড়ি বা পরিবারের কথা নয়—অফিস, এই কাজ, এই সব নিয়েই কথাবার্তা বলেন সুরেশ। বলেন—এ কাজ কি পার্মানেণ্ট?

সামান্য হাসে সুজাতা। সে হাসি দুঃখমলিন। বলে—সেটা নির্ভর করে আমি কতটা কাজ দিতে পারবো তার ওপর। এই সেল্‌সে-এ যদি আমার যোগ্যতা দেখা যায়, তবে আমাকে

পাকাপাকিভাবে কাজে নিয়ে নেওয়াটা বিচিত্র নয় কিছু। এখনো কিছু বুঝতে পারছি না।

সুরেশ বলেন—অন্য কোনোরকম কাজ করে দেখেছো? পড়াতে কেমন লাগে তোমার?

—ভালো লাগে। কিন্তু মনের মত পাচ্ছি কোথায়?

উঠে পড়ে সুজাতা। বলে—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমাকে বাঁচালেন আপনি।

—পরে কবে আসছো?

—আসছে সপ্তাহেই। নতুন একটা বনস্পতির এজেন্সি নিলো কোম্পানি। সেটা নিয়েই আসতে হবে বোধহয়।

—সুরেশের হঠাৎ খুব উৎসাহ দেখা যায়। বলেন—রান্নার বই থাকবে তো?

—নিশ্চয়।

—নিশ্চয় এসো। আরে, রান্না আমার একটা মস্ত শখের জিনিস। আমার ছেলে আবার সে সব বুঝতে পারে না।

বেরিয়ে রাস্তায় পড়তে না পড়তেই বড় বড় ফোঁটা পড়ে গরম রাস্তায়। তারপর হঠাৎ নামে বিষ্টি। ছুটে গিয়ে একটা গাছের তলায় দাঁড়ায় সুজাতা। খুব জল নেমেছে। এখন হয়তো গাড়িটা আসতেও দেরি করবে। অন্য মেয়েরাই বা কোথায়? গাছের নীচে জায়গা অল্প। আরো দু'একজন আসছে ছুটে। বুঝি বাস থেকে নেমে। সুজাতা বুঝতে পারে আজ তার বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। এরপরে অফিসে ফিরতে হবে। তার পরে বাড়ি।

বিষ্টি পড়েছে মোটা মোটা ফোঁটায়, ঝমঝম করে। সামনেটা সাদা করে ফেলেছে। রাস্তায় যেন চোখ চলে না। গাছের ফাঁক দিয়েও জল পড়ছে, ভিজে যাচ্ছে কাপড়। এমনি সময় প্রায় পড়ি

কি মরি অবস্থায় একজন রাস্তা থেকে ছুটতে ছুটতে আসে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে সুজাতার পিঠের ওপর। পড়ে যায় ব্যাগটা সুজাতার হাত থেকে। ব্যাগটা কুড়িয়ে দিতে গিয়ে তখনই চোখে পড়ে দু'জনেই। যে দেয় আর যে নেয় ব্যাগটা, দু'জনেই বিব্রত হয়ে ওঠে।

অসীমের মাথা ভিজে জল পড়ছে, গায়ের জামা ভিজে। সে বলে—আপনি? এখানে?

সুজাতার গলাতেই তেমন স্পষ্ট স্বর কোথায়? তার গলাও যেন তেমন শোনা যায়। বলে—কাজে এসেছিলুম। আপনি?

—আমার বাড়িই তো এইখানে। এই তো একটু আগে।

—ও!

কথা হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে যেন। অসীম বলে—হিন্দুস্থান ট্রেডার্স-এর ব্যাগ দেখছি? আপনি ওখানে আছেন?

—আপাতত।

সুজাতা বোঝে, যে তার কথাগুলো আবার কাটা কাটা বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে নিরুপায়। আঁচলটা গলার ওপর পাক দিয়ে এনে গা ঢাকে। তবু যেন শীত শীত করে।

—স্কুলের ব্যাপারটার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।

অসীম তার দিকে তাকায়নি। অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। সুজাতা এ প্রসঙ্গের উত্থাপনে লাল হয়ে যায়। অসীম আবার বলে—বাবা নেহাৎ গেলেন না বলেই আমি গিয়েছিলুম। তাতে ওরকম একটা পরিস্থিতি হবে জানলে আমি কি যেতাম? জানতুমই না যে আপনি আছেন ওখানে।

—থাক না সে কথা!

—আর বলছি না। কিন্তু কি জানেন, আমি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কতবার যে আপনার ক্ষতি করলাম। সে ক্ষতিপূরণের অবকাশ আপনি একবারও আমাকে দিলেন না।

আকাশটা কি আজ আড়ি করেছে সুজাতার সঙ্গে? বিষ্টি থামছে না। অফিসের গাড়িটা আসছে না। আর যে বিষ্টি! মেয়েরা যে যেখানে হোক দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চয়ই। আসবে কেমন করে? কি বিপদেই পড়েছে সুজাতা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ যায়। তারপর সুজাতা বলে—আপনাকেও আমার ধন্যবাদ জানাবার আছে।

—আমাকে ধন্যবাদ? অসীম নিশ্চয় ভুল শুনেছে। সে বলে—কি বললেন? কেন?

অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে রয়েছে সুজাতা। ফর্সা গলায় নীল শিরাটা যেন কাঁপছে। গর্বিত ঘাড়টার ওপর চুলের অজস্র ধারা ভেঙে পড়েছে কাঁটা খুলে সুজাতা আস্তে বলে—সেদিন হোটেলে যা হয়ে গেল। আমিও কিছু বুঝিনি। আপনি না থাকলে না জানি আমার কত বিপদই হতো। আপনাকে ধন্যবাদ দেব বলে কতদিন ভেবেছি....

খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে অসীম। সে বলে—না-না, সামান্য একটা ব্যাপার! তবু যে আপনার এতটুকু উপকার করতে পেরেছি...

সুজাতা মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ক্ষণিকের আত্মবিভ্রম সে বশে এনেছে। মুখখানা এখনো রাঙা। অসীমের মনে হয় সুজাতাকে এমন সুন্দর সে কোনদিনও দেখেনি। এমনি ভেজা আঁচলে, ভেজা চুলে, শিরীষ গাছের ছায়ায়, বৃষ্টির আঁচলের আড়ালে। চুলের রেখ ভেঙে নেমে এসেছে, চোখে মুখে ক্লান্ত কোমলতা, কণ্ঠস্বর বিনম্র। অসীমের মুগ্ধ দৃষ্টি অকুণ্ঠ। সুজাতা ঈষৎ নীচু গলায় আস্তে আস্তে বলে—একদিন নিজের প্রয়োজনবোধে গিয়েছি, আবার ধন্যবাদ জানাবার জন্য আমারই যাওয়া উচিত ছিলো। ভেবেছিও যাব। কিন্তু কি জানেন? সাহস হয়নি।

—নির্ভয়ে আসতে পারতেন।

—জানি, আপনার ওপর সে ভরসা রাখা চলে, কিন্তু কুণ্ঠা আমার নিজেরই মনে।

—যাক, সে তো হয়ে গিয়েছে।

—হ্যাঁ, তবু ধন্যবাদ। দেখা তো হয়নি।

—আপনি ভিজে গিয়েছেন একেবারে।

সুজাতা ঈষৎ হাসে। আর হাসলে যে তাকে আরও সুন্দর দেখাবে তা যেন জানতো অসীম। তবু জেনেও মুগ্ধ হয়। সুজাতা হেসে বলে—কোনো অসুবিধে হবে না। ঐ তো বিষ্টি ধরে এলো! ঐ যে আমাদের বাস এসে গেছে।

—আবার অফিস পাড়ায় যেতে হবে?

—আমাদের কাজই তো ঐ রকম অসীমবাবু। আচ্ছা, নমস্কার।

ঘাড় ঈষৎ নোয়ায় সুজাতা। তারপর জলে পা ডুবিয়ে ছপ ছপ করে চলে যায় বাসের দিকে। ঠাণ্ডা বাতাসে তার ঘাড়, কান, সব জুড়িয়ে দেয়।

অসীম বাড়ি ফেরে। জামাকাপড় বদলে নীচে এসে দেখে বাবা বসে আছেন অনেকগুলি পালিসের কৌটা সুমুখে নিয়ে। একটা কৌটা তুলেই দেখে হিন্দুস্থান ট্রেডাস-এর নাম ছাপা। বলে—কোথা থেকে এলো?

সুরেশ নিজে চা ঢালেন। বলেন—একটি মেয়ে এসেছিলো। এমন চমৎকার মেয়েটি। যেমন দেখতে, তেমনি কথাবার্তা। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। ক'দিন এসেছে।

—কখন এসেছিলো?

বুঝতে পেরেছে অসীম। বুঝেই কৌতূহলী হয়েছে। সুরেশ বলেন—ঠিক বিষ্টিটার মুখে বেরুলো। আমি তো তাই ভাবছি; আটকে পড়লো কোথাও? বা অন্য কিছু হলো?

অসীম বলে—কি বেচতে এসেছিল?

—দেখ না—কেমন সুন্দর ঝকঝকে করে দিয়ে গেছে জিনিসগুলো। বড় গরীব, কিন্তু মেয়েটি ভারী চমৎকার!

দোষী-দোষী ভাবে হেসে বলেন—আমি মাত্র দুটোদিন দেখলাম। কেমন যেন মায়া হয় রে! এ সব মেয়ে বড় ভাল ধরনের। আমার স্কুলে এই রকম মেয়েরা আসে না? বেশ ব্যক্তিত্ব আছে।

—তোমার স্কুলে? অসীম ঈষৎ অন্যমনা হয়ে হাসে। বলে—নীল শাড়ি পরে এসেছিলো? ফর্সা রঙ সুশ্রী চেহারা? বড় বড় চোখ?

ছেলের কথা শুনে হাঁ হয়ে যান সুরেশ। বলেন—কি করে জানলে? আর তোমার এত ইণ্টারেস্ট?

অসীম চা-এ যথেচ্ছ দুধ ঢালে, চিনি মেশায়। নাড়তে নাড়তে বলে—আমার সঙ্গে ঐ গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। আটকে গিয়েছি বিষ্টিতে। ওই সুজাতা।

—সুজাতা?

—সুজাতা গাঙ্গুলী। সেই ভদ্রলোকের মেয়ে।

সুরেশ এবার বুঝতে পারেন। বলেন—আমার মনটা যে কেন ওর দিকে টানলো! কি যে মায়াবী কথাবার্তা! কি যে দুঃখভরা চোখ! না, ভারী চমৎকার মেয়ে। কই, আমার তো সে রকম উগ্র মনে হলো না?

হঠাৎ সুরেশের মন খুসি হয়ে যায়। বলেন—এবার আসবে বনস্পতি নিয়ে। রান্নাবান্নায় বেশ ঝোঁক আছে মনে হলো। এখন যে আমার-ই ইচ্ছে হচ্ছে যাই গিয়ে আলাপ করে আসি ভালকরে। তার কাজ করবার ধরনটি কি সুন্দর। ভারী লক্ষীশ্রী পূর্ণ। বেশ মেয়ে।

আজ সুরেশের মনটা ভাল লাগছে। ভাল লাগছে এইজন্য, যে তিনি ছেলের মনটা-ও খানিকটা বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে পেরে তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

আজ তিনি একটু অঞ্জনাকে দেখাতে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। বলেন—

—যাবি নাকি?

—না তুমি-ই যাও।

বাবা উঠে গেলেও অসীম বসে থাকে। সুজাতা এসেছিলো, বসেছিলো এই ঘরে। সুজাতা ঘুরে ঘুরে এইসব গৃহসজ্জার ছোট ছোট জিনিসগুলি পরিস্কার কোরছিলো। অসীমের অতিপরিচিত এই ঘরখানাতেই সম্ভব হয়েছিলো সেই দূরায়ত স্বপ্ন—কেমন যেন লাগে তার। মনটা বেশ লাগে। বসে থাকে হেলান দিয়ে। বাবার সঙ্গে সে নাকি কথা কয়ে গেছে কত। কি বলছে জানতে ইচ্ছা করে।

আজকে অসীমের এই ঘরে যেমন সন্ধ্যা নামে, অসীমের মনেহয় বর্ষার মেঘ চাপা ম্লান আলোর এমন অপরূপ সন্ধ্যা সে অনেকদিন দেখেনি। আলো পড়েছে ঘরে। তাতে ঝকঝক করছে পিতলের খেলনা গুলি। সুজাতার বাড়ি-ও লক্ষ্মীশ্রী আছে? হবে-ও বা। সে তো সুজাতাকে কাজ করতে দেখেনি?

তবে এই ঘরে কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন সুজাতা। এই ঘরটি-তে তার হাতের কল্যান স্পর্শ এখনো লেগে আছে। অসীমের মনে হয় কোনো যায়াঠি বোধহয় মুঠোমুটো রূপকথা এনে ছড়িয়ে দিয়েছে এই ঘরে। তাই সব কিছু মনে হচ্ছে মায়াঞ্জনের চোখে দেখা—সুন্দর মোহময়।

দুইদিন ভেবে অসীম একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলে। ফোন করে সুজাতাকে। বলে

—শুনুন, অফিস ছুটি হচ্ছে কটায়?

—কেন পাঁচটায়?

—অফিস হয়ে গেলে নিচে এসে একটু দাঁড়াবেন। কেমন?

উত্তর দিতে সুজাতার বুক ধড়াস ধড়াস করে। তার মনে হয় অসীম-ও তার বিব্রত ও অবাধ্য বুকের সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে।——আচ্ছা। বলে কোনমতে সে ফোন নামিয়ে রাখে। তাদের ঘরে চলে গিয়ে সে জানালার সামনে দাঁড়ায়। কাঁচের মোটা সার্সীতে ঢাকা জানালা। তাতে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে দেখে বহির্জগত-কে। দেখে কি আর? অমনিই চেয়ে থাকে। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে এতটুকু নির্জনতার প্রয়োজন হয়েছে তার। এখন যদি সে মুখফেরায় তবে যেন তার সহকর্মিণীরা ধরে ফেলবে তার মনটা। তা কি বুঝতে পারছে না সুজাতা?

ছুটি হয়ে গেলে পরে নিচে দাঁড়িয়ে সুজাতার সেই ভয়-ই হয়। যদি অসীমের সামনে সে এমনি করে অপ্রস্তুত হয়ে যায়?

অসীম খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়ে, এই যা! গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরতে সুজাতা উঠে পড়ে। আর উঠতে উঠতে স্পষ্ট বোঝে, যে তার সঙ্গী মেয়েরা সকৌতুকে চেয়ে চলে যাচ্ছে।

অসীম প্রথমেই বলে

—চলুন কিছু খাওয়া যাক। পার্কস্ট্রীটের কোণায় চীনেবাড়ীটায় বসে চা খেতে খেতে অসীম সুজাতাকে সহজ হতে অবকাশ দেয়। বলে—কোণার ঐ হলদে বাড়িটা কি জানেন?

জানেনা সুজাতা। কালীঘাটে বাড়ী—পড়েছে আশুতোষ কলেজে! এদিকে যা কিছু ঘোরাফেরা তার, সবই কাজের খোঁজে, আর কাজের তাগিদে। সে হেসে বলে

—এটা বলে কি? কলকাতার অনেক কিছুই জানি না, চিনি না, জানলে আপনি হাসবেন।

অসীম বলে

—ওটা এসিয়াটিক সোসাইটির বাড়ী। অনেকদিনের পুরনো তবে দুঃখের কথা এই, যে সম্প্রতি ওটাকে ভেঙে ফেলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওঁরা।

—কেন?

—ভেঙে ফেলা প্রয়োজন। কেননা ওখানে যে সব বহুমূল্য বই আর পুঁথি আর জিনিসপত্র আছে—তার জন্যে ও বাড়ীটায় আর ঠাঁই কুলোয় না। তবু এতদিনের পুরনো একটা জিনিস—একেবারে থাকবেনা ভাবলে পরে মায়া লাগে।

চা খেতে খেতে অনেক কথা-ই হয়। অবাক হয়ে সুজাতা দেখে, কখন সে সহজ হয়ে উঠেছে। তার নতুন অফিসের কথা, কাজের কথা—আর সহকর্মিণীদের কথা বলছে। শুনতে শুনতে একবার অসীমের মনে হয়, জানায় সুজাতাকে, যে সুজাতা তার-ই বাড়ীতে গিয়েছিল। আবার মনে হয়—না, কাজ নেই। জানলে হয়তো সুজাতা অসহজ বোধ করবে। আর যাবে না ওদিকে। যদি না যায়, তবে সুরেশের সঙ্গে-ও দেখা হবে না তার। আর, কেন যেন অসীমের খুব ইচ্ছে হয় তার বাবা আরো জানুন সুজাতাকে।

চা খাওয়া হলে পরে অসীম গাড়িটা ঘুরিয়ে নেয় ময়দানের দিকে। বলে

—অসুবিধা হবে না ত?

—অসুবিধা কি?

ময়দানের পাশে গাড়ী রেখে দু'জনে ভিক্টোরিয়ার সামনে মাঠের ওপর বসে। তাদের চারিপাশ ঘিরে সন্ধ্যা নামে—ধীরে, অতি সন্তর্পণে। অসীম চুরি করে দেখে সুজাতাকে। সেই ঘাড় বাঁকানো বিদ্রোহিনী কখন যেন কোমল ক্লান্ত ও নম্র একটি মেয়েকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়েছে। সুজাতার গলার স্বরে-ও সবুজ

এক কোমলতা ঝরে ঝরে পড়ে। কিছু কথা বলে সুজাতা—কিছুক্ষণ বা চুপ করে থাকে। কথাবার্তার মধ্যে তার ব্যবার কথা উঠে পড়লে সে প্রসঙ্গ মর্মপীড়া দেবে অসীমকে—তাই পরিবারের কথা বলে না। তার জীবনে এমন কিছু ঘটেনি, যা নিয়ে সে অনেক কথা কইতে পারে। অসীম-ই বলে—নাম না নিয়ে কোন রকম প্রত্যক্ষ উক্তি না করে। বলে

—আমার একজন পিসী আছেন। মা-র পরে-ই তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তিনি কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন।

—আমার কথা তিনি জানলেন কি করে?

অসীম ছেলেমানুষের মতো হাসে। বলে

—স্কুল থেকে আপনি যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন নিজের ওপর আপনার ওপর -দুজনের পরে-ই রাগ হয়েছিল। তাই পিসীকে বলছিলাম।

—তিনি কি বললেন?

—বললেন যে আপনি বেশ করেছেন।

সুজাতা এবার হেসে ওঠে। বলে

—বা, বেশ তো! আমাকে তিনি জানেন না, তবু বললেন বেশ করেছি?

—পিসী ঐ রকম! আলাপ যদি হয় তো দেখবেন—কি রকম ভালোলোক। ভাল কথা, রাখালবাবুর সঙ্গে সেদিন যে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

—কোথায়?

—ঐ অফিসপাড়াতে-ই। ভদ্রলোক মাথানিচু করে চলে যাচ্ছিলেন—আমি-ই কথা কইলাম।

অসীম হেসে আবার বলে—ভদ্রলোকের অবশ্য আমাকে এড়িয়ে

চলবার কারণ আছে। তাই বলে আমার কি সে কথাটা ধরে থাকা উচিত ?

চূড়ান্ত অপ্রস্তুত বোধ করে সুজাতা। বলে

—আবার সেই সব কথা তুলে লজ্জা দেবেন না আমায়।

—না। আপনি লজ্জা পাবেন কেন ? আপনি ত' কোন দোষ করেননি ?

সুজাতা একবার চাইতে পারে শুধু। কথা বলতে পারে না। বলতে পারে না, যে তার সমস্ত আচরণের জন্যেই সে লজ্জিত। অসীম-ও কিছু বলতে পারে না। মনে যে কথা আসে, সে কথা মুখে বলতে পারে না। যেদিন থেকে সে জেনেছে, সে সুজাতার ক্ষমা পেয়েছে—সেদিন থেকে সে আর কারু বিরুদ্ধে কোন নালিশ রাখেনি মনে মনে। সুজাতার ক্ষমা পেয়ে বুকটা তার এত ভরে গিয়েছে, সে অসীম যেন এখন অজস্রধারে মানুষকে অনেক অনুভূতি অনেক ভালবাসা ঢেলে দিতে-ও পারে। সে কূলে কূলে ভরে ছাপিয়ে গিয়েছে।

সে কথা বলে না অসীম। এমনিই চেয়ে থাকে। মনে হয় এই সন্ধ্যা, এই বিস্তৃতি আর এমনি ক'রে সুজাতার মুখোমুখি বসে থাকা—এর যেন শেষ না হয়। যদি কিছু অনন্ত হয়, তো এই সময়টুকু হোক। তাহ'লেই তার অনেক পাওয়া হবে।

তারপর উঠে পড়ে দু'জনে। অসীম এতটুকু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে না, বা এগিয়ে আসে না—তাতে বড় কৃতজ্ঞ বোধ করে সুজাতা। বড় শ্রদ্ধা হয় তার।

সুজাতাকে বাড়ীর আগে চৌমাথায় নামিয়ে দেবার সময়ে অসীম বলে।

—অফিসে বার বার ফোন করলে হয় তো আপনি অপ্রস্তুত

হবেন। জানলাম তো আপনি ঐ সময়ে নামেন? যদি আপত্তি না থাকে, আমি আবার আসব।

এই আসতে চাওয়ার মধ্যে যে ঐকান্তিকতা ফুটে ওঠে, সেটাকে ঢাকবার জন্যেই সে বলে

—আড়ির পরে ভাব তো? তাই একটু সময় দরকার, বুঝলেন না?

সুজাতা সম্মতি জানিয়ে নেমে পড়ে। নেমে একটু দাঁড়ায়। সামনে দিয়ে দুটো তিনটে বাড়ী বেরিয়ে যায়। একটু অপেক্ষা করে রাস্তা পেরিয়ে ঐ ফুটপাথে উঠে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় অসীমের দিকে। মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে বিদায় জানায়। তারপর ঢুকে যায় নিজের গলিতে।

পল্টুকে পড়ায় সুজাতা সন্ধ্যার পর। আজকে কেন যে দিদি পড়াতে গিয়ে সব কথা ভুলে যায়, আর ছুটি দিয়ে দেয় তাকে—পল্টু বুঝতে পারে না।

সুজাতা কয়েকবার ভাবে, মা-কে বলে, যে আজ কেমন করে অসীমের সঙ্গে দেখা হলো—কোথায় গেল সে! কিন্তু কোথায় কেমন করে যে লুকিয়ে থাকে সঙ্কোচ—কিছুতে-ই সহজ হতে পারে না সে। ভাবে আজ থাক কাল বলবো।

॥ দশ ॥

সুজাতার মামা সব বন্দোবস্তই করেছেন। এখন সুজাতার বিয়েটা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারেন মা পল্টুকে নিয়ে। খুব উচ্চাশা তাঁর নেই। তাঁর স্বামীরই মতো কোন একটি পরিশ্রমী, স্বাস্থ্যভালো ভদ্রঘরের ছেলে পেলেই তিনি খুশি হবেন। শ'দুয়েক টাকা মাইনে পেলে যথেষ্ট! দুশো টাকা অনেক টাকা! তাতে দিব্যি গুছিয়ে চলা যায়। আর সুজাতা নিজেও কাজ করবে। স্বামী-স্ত্রী কাজ করবে, দু'জনেই খেটেখুটে গুছিয়ে সংসার করবে, সেই তো ভাল! তিনি নিজে তো গরীব ঘরে পড়েছিলেন। কই, অসুখী তো হননি। সুজাতাই বা অসুখী হবে কেন?

মেয়ে যাই বলুক, মা অনেক ভেবে দেখেছেন। তিনি যদি না বাঁচেন? মানুষের জীবনের কথা কি বলা যায়? সুজাতা বিয়ে করলে তার নিজেরও একটা জোর হবে। পল্টুকে সেই মানুষ করতে পারবে।

তবে ছেলেটি ভাল হওয়া চাই। নইলে যে অভিমানী, চাপা স্বভাবের মেয়ে। ছেলেটি বেশ দরদী না হলে ও মেয়ে সুখী হবে না।

মা-র নিজেরই কি সাধ যায় না? তাঁর মেয়ের মতো দেখতে কটা মেয়ে আছে চেনাশোনার মধ্যে? তবু তো সাজগোজ নেই, বিশ্রাম আরাম নেই। একটু যত্নে থাকলে সুজাতাকে দেখতেও কত ভাল হবে। আর আরামও একটু দরকার মেয়েটার। ঝড়-ঝাপটা কম যায়নি ওর ওপর দিয়ে।

কিন্তু সম্বন্ধ খুঁজতে গিয়ে মা দেখেন, বিয়ের বাজারে তাঁর

মেয়েকেও যাচাই হতে হবে। পাঁচ হাজার বা চার হাজারের কম বিয়ে হয় না। আর মেয়ে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, মা-কে খুশি করবার জন্যে বাইরের ক'টা লোকের সামনে বসে সে যাচাই হতে পারবে না।

তবু মা চেষ্টা করেন। মেয়েকে লুকিয়ে পরামর্শ চলে রাখালের সঙ্গে। কিছুদিন হলো মেয়েকে যেন ঈষৎ গম্ভীর, কোমল, বিনম্র দেখা যাচ্ছে। বিয়ের কথাতেই হয়তো এরকম? নিজের সম্পর্কে যেন একটু সচেতন হয়েছে। আগে আয়নার সামনে দাঁড়াতোই না। এখন মাঝে মাঝে পুরোন পারা-ওঠা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ প্রসাধনের চেষ্টা দেখা যায়।

আর সহসা একটা আশ্চর্য খবর বিস্মিত করে দেয় মা-কে। তাঁর হয়ে রাখালই সুজাতার বিয়ের চেষ্টা করছিলো। ইদানীং সে অফিসার হয়েছে ছোটখাটো। আর যেমন তেমন হোক, বাড়িও একখানা আছে এ পাড়াতেই।

রাখাল একদিন নিজেই বলে মা-কে। তাঁর রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে। সব কথা যেমন অবহেলে খেলাচ্ছলে বলে, তেমনি ভাবেই বলে। বলে—অত দূরে পাটনায়, জামশেদপুর, নাই বা গেলেন?

—ইচ্ছে থাকলেই ঘরের কাছে ছেলে পাচ্ছি কোথায়?

—ইদানীং দাদারাও আমাকে বলছে। আমিও ভাবছি বত্রিশ বছর বয়স হলো। বিয়ে তো করতেই হবে। ধরুন, আমিই যদি বিয়ে করতে চাই—আপনি বিয়ে দেবেন? না-না, আপনি ভেবে দেখুন! সুজাতাকে বলুন। তারও মতামত আছে। এ ব্যাপারে তার মতামতটাই অনেক বড়ো।

রাখাল চলে যায়। কৃতজ্ঞতায় মা-র মনটা ভরে যায়। সহসা এই সামান্য গৃহস্থালী, সব কিছু তাঁর ভাল লাগে। মনে হয় এতদিন ধরে দেখছেন, তবু যেন রাখালের মহৎ মনটাকে চিনতে পারেননি।

মনে হয় সত্যিই তো! না ডাকতে চিরদিন হাতের কাছে পেয়েছি, তাই তার দিকে চেয়ে দেখিনি। নইলে রাখাল ছেলে হিসেবে অযোগ্য কোথায়। বি. এ. পাস করেছে। তিনশো টাকা পাচ্ছে। স্বাস্থ্য ভালো। কথাবার্তা হয়তো বা একটু রুক্ষ। কাটছাঁট। তা অমন শক্ত ছেলে হলে তবেই তাঁর সুজাতাকে বশ করতে পারবে।

সুজাতা সেদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফেরে। বলে—মা! অসীম মৈত্রকে তোমার মনে আছে? সেদিন তিনি না থাকলে আমি বিপদেই পড়তাম। আজ দেখা হয়েছিলো হঠাৎ। ঐ অফিস-পাড়াতেই। আমাদের অফিস বিল্ডিং-এ অন্য অফিসে এসেছিলেন কি যেন কাজে। লিফ্‌টে উঠছিলাম আমরা একসঙ্গে। একটা কাজ করেছি মা! তাঁকে হঠাৎ আসতে বলে ফেলেছি। বলেছি—আসবেন, চা খাবেন! আমার মা-ও খুশি হয়েছেন। এই যে, এনেছি সব, তুমি চা করে দিও মা। কেমন? গল্প ক'রো, আমি এসে যাব।

—তুই থাকবি না?

—বা, টিউশনী নেই? ক'দিন কামাই হলো যে? এখন পরীক্ষা এসে গেছে, না গেলে হবে না। আমি চলে আসবো।

সাতপাঁচ ভেবে মা আর এখন কিছু বলেন না। বলেন—তাই হবে। আহা, ছেলেটি বড় ভালো!

তাড়াতাড়ি চলে যায় সুজাতা। মা ঘরখানা পরিস্কার করেন। অপেক্ষা করেন। মনে ভাবেন, এবার ছেলেটি এলে সুজাতার বিয়ের কথাও বলবো। যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বাকিটুকু ভালোভাবে নির্বাহ হলেই বাঁচি।

সুজাতা বলবার আগেই অসীম-ই ভাবছিলো এবার একদিন তাকে যেতে হবে সুজাতার মা-র কাছে। অদৃষ্টের নির্মমকৌতুকে সে যে দুর্ভাগ্য টেনে নামিয়েছে এই পরিবারটির ওপর, তার ক্ষতিপূরণ

একভাবেই হতে পারে। সে ছেলে হয়ে দাঁড়াতে পারে সুজাতার ভার নিয়ে। সুজাতার সম্পর্কে তার নিজের মন সে জানে। আর সুজাতার মনই কি তাকে কোন কথা দেয়নি? কথা কি শুধু মুখে বলে তবে বোঝাতে হবে? যে কথা বলা হয়না যে কথা কানে শোনা যায় না। সে কথা কি হৃদয় শোনে না? নিশ্চয় শোনে। তা যদি না হতো, তাহ'লে সুজাতার মতো মেয়ে কেমন করে তার সঙ্গে এমন স্বচ্ছন্দে মিশতো? এত সহজ হয়ে ধরা দিতো?

এ কথা কেন বললো অসীম, তা কি বোঝেনি সুজাতা? নিশ্চয় বুঝেছে। অসীম নিশ্চয় জেনেছে—তার সব কথাগুলি-ই বুঝেছে সুজাতা।

অসীম এলো সন্ধ্যার সময়ে। সাত পাঁচ ভেবে পলটুর জন্যে চার নম্বর ফুটবল একটা, স্ট্যাম্প অ্যালবাম, এমনি কতকগুলো জিনিস এনেছে।

পলটুও আজ গম্ভীরভাবে এগিয়ে এসে ভাব করে। লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে কেন্দ্র করে কথাবার্তাটা খুব তাড়াতাড়ি জমে ওঠে। খেলনা ও জিনিসগুলি দেখিয়ে মা-র কাছে অসীম অনুমতি চাইবার মতোই বলে—সামান্য খেলনা আর কি! আমরাও ছোট ছিলাম তো?

বড় বড় খেলোয়াড় সম্পর্কে অসীম এত খবর রাখে যে আশ্চর্য না হয়ে পারে না পলটু। চোখ বড় বড় করে বলে—আপনি গোস্বামী, সুব্রহ্মণ্যম্, সকলকে চেনেন?

—নিশ্চয়। তোমাকে অটোগ্রাফ খাতাটা দিয়ে দেবো। দেখবে সকলের অটোগ্রাফ রয়েছে।

মা আরো কাছে এসে বসেন। বলেন—সুজাতা পড়াতে গিয়েছে। এখনি আসবে। খাও বাবা তুমি। সামান্য জিনিস তো! একটুও ফেলে রেখ না।

খেতে খেতে অসীম হঠাৎ মুখ তুলে হেসে বলে—আপনার গলার স্বরটা অনেকটা মা-র মতো! মা নেই তো! মা-র গলা কতদিন শুনিনি। মনে হয় আপনার গলাটা শুনলে যেন কেমন সাদৃশ্য পাই।

—আহা, মা নেই?

—নাঃ, দশ বছর হয়ে গেল।

কেমন সহজ পরিবেশ আজ এ ঘরের। অসীমের খুব ভাল লগে। মা সুপারী এলাচ এনে দেন। তারপর বলেন—আমরা কাশী চলে যাচ্ছি।

—কবে? বেড়াতে?

—না। দাদা রয়েছেন। পল্টুকে নিয়ে আমি ওখানেই থাকবো। আর একটা সুখবর....

কি সুখবর না জেনে অসীম হাসিভরা চোখে তাকিয়ে থাকে একবুক প্রত্যাশা নিয়ে।

মা বলেন—সুজাতার বিয়েরও একরকম ঠিক হয়ে গেল। একটু হঠাৎই হলো কথাটা। ছেলেও আমাদের ঘরের ছেলে। পল্টু সুজাতা রাখালদা বলে ডাকে।

শুনতে শুনতে অসীমের মুখ নিমেষে অপ্রত্যাশিত এই আঘাতে কালো হয়ে যায়। সুজাতার বিয়ে? রাখাল, মানে, সেই ছেলেটির সঙ্গে? বলিষ্ঠ, শ্যামবর্ণ সেই ছেলেটি। সুজাতার মা আরো কত কথা বলছেন? গলাটা যেন তাঁর দূর থেকে আসছে। এতদূর থেকে যে কানে শুনতে পাচ্ছে না অসীম। মা বলছেন—ছেলে হিসেবে চমৎকার। তিনশো টাকার চাকরি হয়েছে। দেনাপাওনা থাকবে না। সুজাতারও চেনাজানা। আমি যেন নিশ্চিন্ত হয়েছি। বুক থেকে যেন পাষাণ ভার নেমে গিয়েছে।

শুনতে শুনতে অসীমের কি যে উদ্‌ভ্রান্ত লাগে। বুকটা ভাঙা

কি একেই বলে? এ অনুভূতি এমন হবে জানলে কি অসীম ভালবাসতো ঐ হৃদয়হীন মেয়েকে? তার কোনটা সত্যি? এই যে দিনের পর দিন মেলামেশা, এই যে ঘুরতে ফিরতে বেড়াতে কতভাবে, কত সাজানো কথার ছলনার আড়ালে নিজের মনকে মেলে ধরা—সেগুলো কি অভিনয়? তবে কি শেষ অবধি এমনি করে অসীমের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলো সুজাতা? সেইজন্য এতদিন ধরে অসীমের রক্তাক্ত হৃদয়টাতে সান্ত্বনার প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়েছে সুজাতা? শেষ আঘাত ভাল করে হানবে বলে?

অসীমেরও কিছু বলা উচিত নয় কি? কি বলবে অসীম? নিষ্ঠুর হৃদয়, অতি নির্মম এক মেয়ে সুন্দর ক'টি আঙুলের স্পর্শে যেন জাগিয়ে তুলেছিলো অসীমের প্রত্যাশার মঞ্জরীগুলি। আবার অতর্কিত এক আঘাতে সে অসীমকে আবার নির্বাসিত করেছে অন্ধকারে। রাখালের সঙ্গে তার বিয়ে, এই কথা বলতে কি ডেকেছিল সুজাতা? সেই বা এসেছিলো কেন? অসীম উদ্‌ভ্রান্ত এক হতাশা বুকে চেপে ধরা গলায় বলে—বেশ তো! আনন্দের কথা। বললেন আমাকে! যা যা দরকার সব করে দেবো। কবে বিয়ে?

—যত তাড়াতাড়ি পারি। টাকার জোর তো নেই। সামা আয়োজন। তা হয়ে যাবে।

—কোনদিন তো আমাকে কিছু করতে দিলেন না....এবার বিয়েতে....অবশ্য যদি গ্রহণ করেন ..? আচ্ছা আজ আমি কেমন?

—সে কি! সুজাতা আসবে যে?

—না, না। সুজাতার নামেই ভয় পাচ্ছে অসীম। সে বলে কোন দরকার নেই। বুঝিয়ে বলবেন আপনি।

প্রায় ছুটে নেমে চলে যায় অসীম।

গাড়ী নিয়ে আজকে অসীম চলে যায় অনির্দিষ্ট পথে। যশোর রোড ধরে গাড়ী তার এগিয়ে চলে। দুইপাশে অন্ধকার। ক্রমে আসে জনতা ও জনপদ। এগিয়ে চলতে চলতে এক জায়গায় এমনিই রুখে দেয় গাড়ী। মাথা রেখে বসে থাকে জানলায়। শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছে, শিরাগুলো ফেটে ফেটে যাচ্ছে। সুজাতা এ কি করলে। তুমি এমন কেন করলে? এই প্রশ্ন সে বার বার শুধোয় আর বার বার নিরুত্তর এক প্রিয় মুখের ছবি থেকে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তার সকল প্রশ্ন। কোথা দিয়ে কী হলো? তার এ নির্বোধ হৃদয় এমন করে সব বিলিয়ে সুজাতাকে ভালবাসলো কেন? তার এ ভালোবাসা নিয়ে সে কি করবে? রাখবার ঠাঁই নেই। ফেলতে পারবেনা—শুধু কি নিজেকে রক্তাক্ত করবে। এই তার নিয়তি? কোন্ নিয়তি তাকে সুজাতার সঙ্গে এমন করে জড়ালো? কাকে দুঃখ দিয়েছে সে? কোন্ অন্যায় করেছে?

আর দু'খানা ট্রাকের রক্তচোখের সামনে তবে সম্বিৎ ফিরে পায় অসীম। গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরতে রাত একটা বেজে যায়। আজ আর জামাকাপড় খোলে না, জুতো-ও ছাড়ে না অসীম। বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বালিশে মুখডুবিয়ে একটাই বোবা প্রশ্ন তার সমস্ত হৃদয় মনের কথা হয়ে ফেটে পড়ে—সুজাতা, তুমি এ'কি করলে?

কোন জবাব পায়না অসীম।

সুজাতা তাড়াতাড়িই ফেরে। কিন্তু অসীমকে না দেখে আশ্চর্য হয়। মা বলেন—কেন জানি না, হঠাৎ চলে গেল। বললে—কাজ আছে।

তারপর বলেন—তোর বিয়ের কথা বললাম।

—কি বললে?

—রাখাল আজ এসেছিলো। তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

আমি যেন বেঁচে গিয়েছি। আহা, এমন মহৎ মন ছেলেটির! এমন স্বামী পাওয়া ভাগ্যের কথা, জানলি সুজাতা?

—কবে তোমাকে বললো রাখালদা?

—আজই দুপুরে।

—অসীমবাবুকে বললে তুমি?

—হ্যাঁ। খুব খুশি হলো রে? বললো, কোনদিন তো কিছু করতে দিলেন না, বিয়ের সময়ে আপত্তি করবেন না।

—এই কথা বললেন?

—হ্যাঁ রে!

বিছানায় শুয়ে মুখ গুঁজে সুজাতা ভাবে আর মনে হয় মস্তো একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাকে ফেলেছে সবাই। রাখালদা তাকে দয়া করেছে, অসীম তার দাক্ষিণ্য দেখাবার আর একটা সুযোগ পেয়েছে। রাখালের সম্পর্কে সে ভাবে না। রাখালদাকে শুধু বললেই হবে। নিমেষে বুঝবে রাখালদা কত হাস্যকর তার প্রস্তাব। আর অসীম? অসীমকেও সে বলবে যে, সে অসীমের কোনো দাক্ষিণ্য চায় না। কোন সাহায্য চায় না।

অফিস ভাঙবার মুখ। অসীম উঠবে, এমন সময় ঢুকলো সুজাতা। কি বলতে এসেছে সে? এসেছে আবার আঘাত করতে? এসেছে আবার জিতে যেতে? এসেছে অসীমকে আবার অপমান করতে?

অসীমও আজ ছাড়বে না। আঘাত দিয়েছে সুজাতা, প্রত্যাঘাত সে পায়নি। আজ সেও বলবে সুজাতাকে প্রয়োজন হলে।

সুজাতা বলে—আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে আমার। সময় আপনাকে করতেই হবে।

এ সেই বিদ্রোহিনী। ক'দিনের পরিচিত দুঃখী, নম্র, ক্লান্ত

সুজাতা নয়। ঘাড় টানটান, চোখে স্পষ্ট বিদ্যুৎ, অধর সুকঠিন। অসীম বলে—হাতের কাজ সেরে নিই।

হয়ে যায় কাজ। নেমে এসে গাড়ি খুলে ধরে অসীম। সুজাতা বসে সামনে। বলে—চলুন কোথাও। যেখানে বসে কথা কওয় যায়।

—সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

—তাতে কি?

রেড রোডে গাড়ি রেখে দুজনে নেমে আসে গড়ের মাঠের সবুজ বিস্তৃতিতে। দূরে দূরে জ্বলে আলো। মাঠের ওপর অন্ধকার গড়িয়ে গড়িয়ে নেমেছে। বসে দুজনে! কোমল ও শ্যামল আঁধার সেদিনের বৃষ্টির মতোই দু'জনকে আড়াল করে ঘিরে আসে। অসীম অপেক্ষা করে। সুজাতা বলে—আপনি ভেবেছেন কি?

—কি বিষয়ে?

—কাল মা-র কাছে কি বলে এসেছেন?

—কি বলে এসেছি? শুনলাম আপনার বিয়ে, তাই, শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছি।

—কে আপনার শুভেচ্ছা চায়? কে বলছে, আপনাকে সাহায্য করতে? আমি বলেছি?

—সাহায্য করতে চেয়েছি। বন্ধুজনের মত····

—বন্ধু, বন্ধু··আপনার সঙ্গে আমাদের আবার বন্ধুত্ব কি অসীমবাবু? আপনি অনেক উঁচুতে থাকেন, তাই থাকুন—আমার দারিদ্র্য নিয়ে আমি তো আপনার জীবনে গিয়ে পড়িনি?

—না। আমিও স্বেচ্ছায় আসিনি। ভাগ্যের এক অদ্ভুত প্রহসন যে, আমাকে আপনাদের মধ্যে বার বার নিয়ে ফেলতে হচ্ছে। অবাঞ্ছিত, একান্ত অবাঞ্ছিত আমি, তবু আমার হাতে তো সবটা নয়! আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করছি···

—কি চেষ্টা করছেন ? বারবার চেষ্টা করছেন দয়া জানাতে, দাক্ষিণ্য জানাতে····নিজের মহত্ব প্রমাণ করতে ··

—সুজাতা !

—বলতে দিন আমাকে অসীমবাবু, বারবার বলতে তো আসব না। আমার কাজ আপনি নষ্ট করেছেন····যখন যেখানে গিয়েছি···· তারপর····

—তারপর আমি বলি সুজাতা। তোমার বিয়ে রাখালবাবুর সঙ্গে, সে তো আনন্দের কথা। তবে তাই জানাতে তুমি আমাকে তোমার বাড়ি ডেকে নিয়ে গেলে কেন ? আমি তো ছলনা করিনি। তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি যে, একদিনের ঘটনায় আমি তোমাদের জীবনে কি দুর্দিন টেনে নামিয়েছি। আমি দিনের পর দিন চেষ্টা করেছি কেমন করে এতটুকু উপকার করতে পারি, সাহায্য করতে পারি···

—আপনার দয়া তো আমি চাই না অসীমবাবু। আমার বিয়ে হবে, কে বললো আপনাকে ? মা বললো ? কি জানে মা ? বিয়ে তো আমি করবো ! আর যদি বিয়েই হয় আমার—আপনি কেন সাহায্য করতে আসবেন ? আপনি বোঝেন না কেন ?

—বোঝে না কে ? নির্বোধ, বড় নির্বোধ তুমি সুজাতা ! বড় মিথ্যা তোমার আত্মবিশ্বাস। এই অহঙ্কার তোমাকে এমন অন্ধ করেছে যে, দেখতে পাওনা তুমি !

সুজাতার চোখ দিয়ে এবার জল পড়ে। সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—কে আপনার দয়া চায় ? শুধু দয়া করে সরে আসবেন ? জোর করতে পারেন না ? দাবী করতে পারেন না ? না সেখানেও জিতে যেতে চান ? সেখানে-ও আপনার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়তে হবে ? বড় নিষ্ঠুর আপনি অসীমবাবু। দয়া করতে চান, করুণা দেখাতে চান—আর চান, যে আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিই ?

—দয়া, দয়া—শুধু দয়াই দেখলে তুমি। আমার হৃদয়, আমার মন, কিছু দেখলে না। বল, আরও খুলে দেখাবো? আরও নগ্ন করে দেখাতে হবে?

সুজাতা কথা বলে না। অসীম শক্ত দুই হাতে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দেয়। তুলে ধরে মুখ। যন্ত্রণায় অবরুদ্ধ কণ্ঠ নামিয়ে বলে—ভালবাসা দেখতে পাও না? দেখতে পেলে না যে তোমাকে ছাড়া টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছি? কেমন করে বোঝাবো?

এতদিন যেন বন্যার মুখে বাঁধ দিয়ে রেখেছিল সুজাতা—আজ সব ভেঙে ঢল নামে। সুজাতা এবার ভেঙে পড়ে নিজের দুই হাতের উপর। অসীম তাকে কিছুতে থামাতে পারেনা। বলে

—শোন সুজাতা,—

—আমি আর কোন কথা শুনতে চাই না। আমি আর পারিনা অসীমবাবু। আপনি বিশ্বাস করুন, এমন করে আমি আর পারি না।

গাড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে সুজাতা। অসীম চালাচ্ছে গাড়ি। কোথায় চলেছে তাকিয়ে দেখছে না সুজাতা। ঝড়ের পরে শান্ত হয়েছে মেয়ে। অসীম চোখ মুছিয়ে দিয়েছে। পকেট থেকে চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। সুজাতা কোন বাধা দেয়নি।

অসীম এখন সামনে তাকিয়ে অনেক কথা বলছে। বুকভরা আশ্বাসের কথা ভাল ভাল কথা। আস্তে করে। নীচু গলায়। সুজাতা শুনছে। শুনছে, আর সমস্ত দেহ মন জুড়ে শান্তি নামছে। অনেকদিন এমন শান্তি জানেনি সুজাতা। অসীম বলছে—আমার ঘর শূন্য। তুমি এলে ঘর ভরে উঠবে। আসবে না সুজাতা?

কথা না কয়ে ঘাড় কাত করে সুজাতা। চায় অন্য দিকে। সুখের হাসি হাসে মুখে, আর চোখের পাতায় জল।

অসীম বলে— .

—তোমার দায়িত্ব আমার হলো। এত ভাববে কেন তুমি? আর, আর যদি মনে বিশ্বাস থাকে সুজাতা, তবে নিশ্চয় জেনো তোমার বাবাও তোমাকে আশীর্বাদ করছেন।

আরো একটু হেলান দিয়ে বসে সুজাতা। কথা কয় না। রাস্তার আলোছায়া অসীমের মুখে খেলা করে করে সরে যায়। অসীম গাড়ি থামায়। বলে—নেমে এসো।

—এসে গেলাম? ইতস্ততঃ করে সুজাতা। সেই লাল দোতলা বাড়ি। অসীম বলে—এসো!

—কি ভাববেন?

অসীম হাসে। বলে—কে বলেছে? বাবা আমার সহস্র অন্যায় বুক দিয়ে ঢেকে চলেছেন। আজ তিনি কত আনন্দ করে য ডেকে নেবেন তোমাকে, তুমি জানো না। পরিচয় না জানতেই তুমি তাঁর মন জয় করেছ সুজাতা, আজ তুমি নিজের পরিচয়ে নিজের জোরে আসছো। লজ্জা কি?

অসীমের হাত ধরে নেমে আসে সুজাতা। সুজাতা আর সীম যখন পাশাপাশি ঢোকে, আর কিছু বলবার দরকার হয় না রেশকে।

তাঁর অজস্র আশীর্বাদের সামনে সুজাতা গলে যায়। থরথর পা কাঁপে তার। অসীম আর সুজাতাকে নিয়ে লক্ষ্মীর ছবির দিকে তাকান সুরেশ। মাথা নীচু করে সুজাতা।

লক্ষ্মীর চোখমুখ থেকে আজ আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে। বিগলিত ই করুণার ধারা; সুজাতার চোখেও নেমেছে। সুজাতা লজ্জা পায় না আজ।

॥ শেষ ॥